অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধানাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত "কুমারীর পবিত্রতা" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পরিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০১০

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

পঞ্চম খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(পঞ্চম খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৬

— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ —

— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক—ত্রিশ টাকা]   [মাশুলাদি স্বতন্ত্র

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০৩৩৩
"সাধন কুঞ্জ" ঃ হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২২০৩২২৮

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

পঞ্চম খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলী (যাহা ১৩৬৫ সালের "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছে) পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার পঞ্চম খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি বহুস্থানে পাঠাইতে হইত বলিয়া প্রধানতঃ অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল।

নিবেদনমিতি—রথ-দ্বিতীয়া, আষাঢ়, ১৩৬৬

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

অযাচক আশ্রম,
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী।
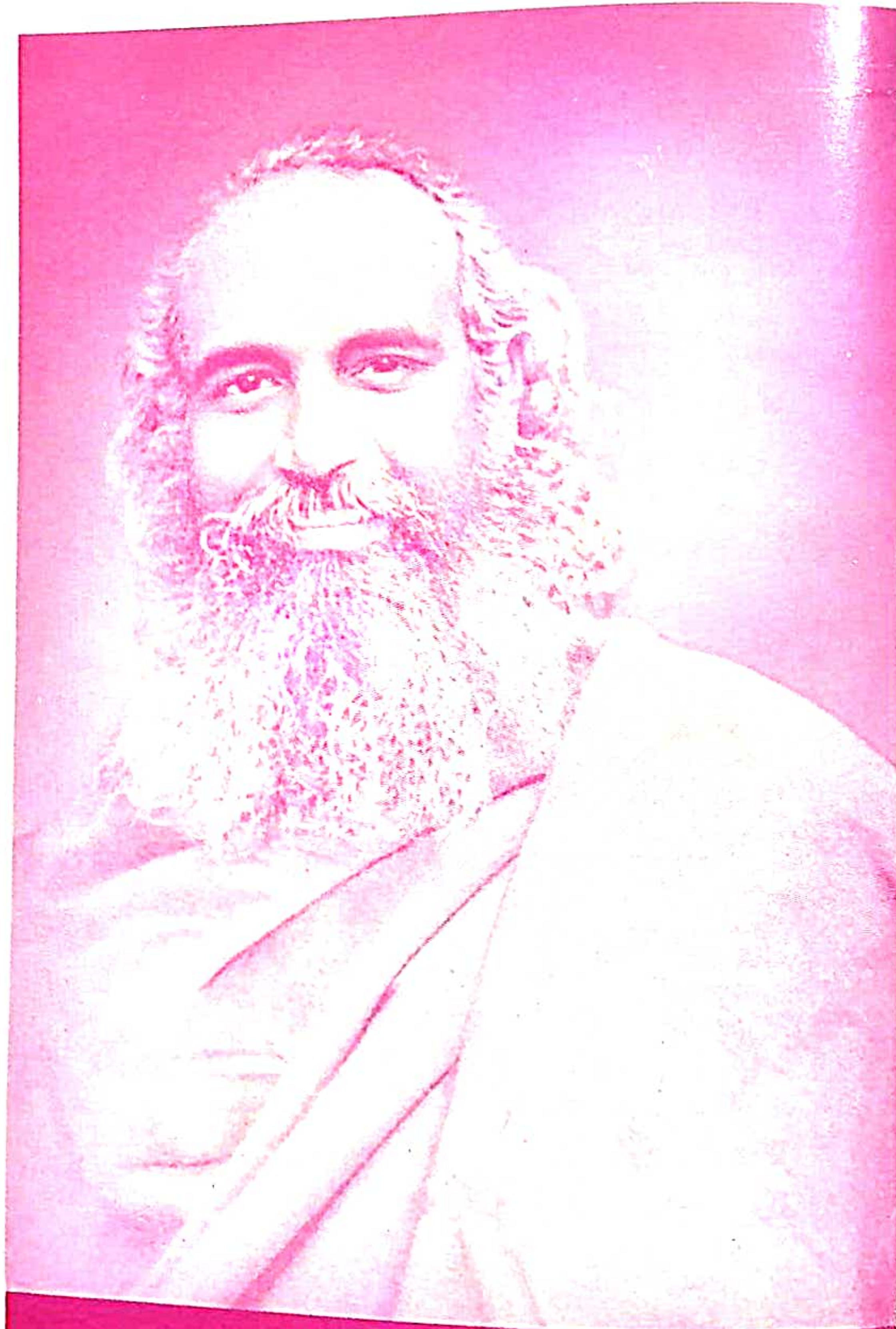
ধৃতং প্রেম্না

(পঞ্চম খণ্ড)

(১)

হরি-ওঁ

ইন্দ্রনগর (জামশেদপুর)
৬ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের গুরুভ্রাতাদের সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহাকে আহ্লাদের বিষয় মনে না করিয়া দুশ্চিন্তার বিষয় বলিয়াও মনে করা চলিতে পারে। কেন এত লোক দীক্ষা নিতেছে? দীক্ষাগৃহে এই যে নিদারুণ ভিড়, তাহা কি কেবলই অভিনন্দনের যোগ্য ব্যাপার, না ইহা নিয়া উদ্বিগ্ন হইবারও কারণ আছে? হাজার হাজার নরনারী তোমরা দীক্ষিত হইতেছ। কেন হইতেছ? হুজুগে পড়িয়া কি?

আমি কিন্তু ভাবিত হইয়াছি। আগ্রহ করিয়া আসিলে আমি সকলের প্রতিই উদার, ইহাই কিন্তু যথেষ্ট নহে। কিছু কিছু ছেলে মেয়েকে কখনও কখনও আমি দীক্ষাগৃহ হইতে এই বলিয়া বাহির করিয়া দিয়া থাকি যে তাহাদের প্রতীক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে,

ইহাও যথেষ্ট নহে। যাহারা দীক্ষা নিয়া যাইতেছে, তাহারা ঘরে ফিরিয়া প্রত্যহ সাধন করিবে, সপ্তাহের সমবেত উপাসনাটীতে অবশ্যই ভক্তিভরে যোগ দিবে এবং সহযোগিতা করিবে, সকল সম্প্রদায়ের সাধকদের প্রতি অন্তরের প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিবে আর নিজেদের মধ্যে কোন ভেদ-বিসম্বাদ, দলাদলি করিয়া সামাজিক আবহাওয়া কলুষিত করিবে না, প্রত্যেকে নিজ নিজ অতীতের পাপাসক্তি ও কদভ্যাসসমূহ বর্জ্জন করিয়া চলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, সাধ্যমত অদোষদর্শী হইয়া এবং অমানীকে মান দান করিয়া নম্র, বিনীত, নিরহঙ্কার হইয়া চলিবে, ইহা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করিব। ইহা না হইলে, লোকেরা দলে দলে দীক্ষা নিতেছে, শুধু ইহাই যথেষ্ট নহে।

আগেকার দিনে কুলগুরুরা দীক্ষা দিতেন। অনেক কুলগুরু এখন আর দীক্ষাদান তৃপ্তিপ্রদ জ্ঞান করেন না। অনেক কুলগুরু অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়া দীক্ষাদান-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়াছেন। অনেক কুল-গুরু শিষ্য-বংশের লোকদের শ্রদ্ধা উদ্রেকে অসমর্থ হইয়াছেন। অথচ গুরুর আবশ্যকতা-বোধ লোকের কমে নাই। ইহার ফলে নূতন শ্রেণীর গুরুদেবদের আবির্ভাব হইয়াছে। কোথাও সত্য সত্য লোকপাবন উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া গুরুদেবরা কাজ করিতেছেন। কোথাও বা ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতির ন্যায় গুরুদেবগিরি অত্যন্ত লাভপ্রদ ব্যবসায় রূপে পরিগৃহীত হইয়া সুশৃঙ্খল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী বিপুল বিস্তারের অভাবনীয় ব্যবস্থা সমূহের অধীন হইয়াছে। নিজ নিজ অন্তরের উদ্দেশ্যানুযায়ী এই সকল গুরুদেবদের অন্তিম গতি হইবে। কিন্তু বেশী ভাবনার বিষয় দাঁড়াইয়াছে শিষ্যদের নিয়া। ইহারা দীক্ষা নিবে, সাধন করিবে না। ইহারা দীক্ষালাভের

আগেও নৈতিক জীবনে যাহা ছিল, দশ বৎসর পরেও ঠিক তাহাই থাকিয়া যাইবে, কোনও উন্নতি ইহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইবে না। দীক্ষার আগেও যেমন ছল-চাতুরী, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা-প্রতারণা প্রভৃতি চলিত, দীক্ষার পরেও তাহাই চলিতে থাকিবে। ইহার পরে লোকের মনে কি এই প্রশ্ন স্বাভাবিক নহে যে, তবে এত লোকে দীক্ষা নিতেছে কেন? গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় প্রথার অনুসরণ করিলেই ত' জগতের কোনও লাভ হইবে না। দীক্ষার ফলে মানুষের অন্তরের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া সে উদার হইবে, তাহার দুর্ব্বলতা কমিয়া সে সবল হইবে, তাহার অন্ধ-কুসংস্কার বিদূরিত হইয়া সে চক্ষুষ্মান সদসদ্‌বিচারক্ষম বীর্য্যবান সমাজ-মঙ্গল-কর্ম্মী হইবে, তাহার আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা বিনাশ পাইয়া তাহাকে আদর্শ জগন্মঙ্গলকামী করিবে,— ইহাই ত' প্রত্যাশিত। এই প্রত্যাশার যদি পূরণ না হইল, তাহা হইলে কেবল কি দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়িলেই উৎফুল্ল হইব?

দীক্ষাদানকালে তোমাদের বারংবার বলিয়াছি,—তোমরা তোমাদের সমদীক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করিও না; নিজেরা সাধন করিয়া বলশালী হও, তাহার ফলে আপনিই লক্ষ লক্ষ কল্যাণকামী নরনারী দীক্ষালাভকে জীবনের পরম লাভ বলিয়া বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইবে। দীক্ষা নিয়া একদল লোক মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, এই দৃশ্য চখের উপরে দেখিবার পরে আর ত' কেহ অন্ধ বিশ্বাসের তাড়নায় আসিবে না। আসিবে জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়া। অন্ধ বিশ্বাস হুজুগ সৃষ্টি করে। হুজুগ সঙ্কল্পের শক্তিকে অস্থায়ী করিয়া দেয়। দুর্ব্বল সঙ্কল্প লইয়া কাজে নামিলে কাজ অকালে পণ্ড হয়।

তোমরা কথাগুলি ভাবিয়া দেখিও। প্রেম সহকারে কথাগুলি বিবেচনা করিও। বিশাল এক সম্প্রদায়ের গুরু রূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়া আমার কি লাভ হইবে? দলে দলে জনকল্যাণকামী চরিত্রবলসমৃদ্ধ কর্ম্মবীরের আবির্ভাবই আমার কাম্য। দীক্ষা তোমাদের সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিবার জন্য দিয়াছি, আমার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। তোমরা যদি নিজেদের মূল্য নিজেরা বাড়াইতে চেষ্টা না কর, তাহা হইলে কেবল দীক্ষা দিয়া কে কবে জগতের কল্যাণ করিতে সমর্থ হইবে? প্রেমসহকারে কথাগুলি ভাবো। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২)

হরি-ওঁ

চক্রধরপুর (সিংভূম)
৯ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র অনেক দিন হয় পাইয়াছি। উত্তর দিবার অবসর হয় নাই। কিন্তু চক্রধরপুর আসিয়া পাইলাম অঢেল বিশ্রাম। কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, জনতা নাই, ভিড় নাই, আগ্রহাকুল নরনারীর অধীরতা নাই, সংখ্যাতীত দর্শনার্থীর ঠেলাঠেলি নাই, এক চমৎকার বিশ্রাম। এই কয়দিন প্রখর গ্রীষ্মে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া ঘুরিয়াছি, আজ আকাশও মেঘাচ্ছন্ন, বাতাসও ঠাণ্ডা। অবশ্য আজই পুপুন্‌কী রওনা হইব এবং কাল রাত্রে এখানে মাত্র পঁয়ত্রিশটী শ্রোতার সমক্ষে দুই

ঘন্টা ব্যাপিয়া বক্তৃতা দিয়াছি,—"মানুষের লোভই জগতে অশান্তি আনিয়াছে।" শ্রমের পাত্র নাই, তবু শ্রম করিয়াছি পুরা। কাল কিছুই হয় নাই। একটী হৃদয় গলে নাই, একটী প্রাণে আবেগ জাগে নাই। শ্রমের এই ব্যর্থতা মনের ভিতরে এই আবহাওয়াই সৃষ্টি করিয়াছে যে, শ্রম আমি কিছুই করি নাই। তাই আজ অফুরন্ত বিশ্রাম। সেই অবসরে লেখনী ধরিলাম।

তুমি আমাকে স্বপ্নে পাইতেছ বলিয়া লিখিয়াছ। আমি বলি, ইহা তোমার স্বপ্ন নহে, ইহাই তোমার জাগরণ। আমাকে লইয়া যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ তোমার মৃত্যুও নাই, নিদ্রাও নাই। আমাকে লইয়া স্থিতিই তোমার জীবনের প্রকৃত জাগ্রত সত্তা। একথা তুমি যে নিজের সাধন-বলেই বুঝিতে সমর্থ হইতেছ, ইহাই আমার আনন্দ। নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ অন্তরে কেবল সাধন করিয়া যাও। সাধন করিতে করিতে আরও গভীরতর সত্যে উপনীত হইবে। তখন দেখিবে, তোমাতে আর আমাতে ভিন্নতার কল্পনা অবাস্তব। তুমি আর আমি মিলিয়া তখন এক হইয়া যাইব। তোমাকে ছাড়া আমার আর আমাকে ছাড়া তোমার কোনও পৃথক্ অস্তিত্বই থাকিবে না।

মানুষ সাধন করে না। এই জন্যই সাধনের ফলে যে অতীন্দ্রিয় সত্যের উপলব্ধি প্রত্যেকের পক্ষেই অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইতে বঞ্চিত রহিয়া যায়। তুমি সাধন কর। আরও সাধন কর। তোমার সাধনের যে শেষ নাই, এই প্রত্যয় নিয়া অধিকতর বিক্রমে সাধন করিতে থাক।

তবে একটী কথা মনে রাখিও। তুমি যে সাধক, এই কথাটা বাহিরে যত অপ্রকাশ থাকে, তত ভাল। তোমার সাধনলব্ধ প্রজ্ঞা

অপরের অজ্ঞানতা বিদূরণে আপনা আপনিই সহায়তা করিবে। নিজেকে জাহির করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। সাধন করিয়া এমন প্রেমিক হও, যাহার শুদ্ধ শুভেচ্ছা সকলের অজ্ঞাতে চতুষ্পার্শ্বস্থ দশ যোজন স্থানের প্রতিটি অন্তরে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১০ই আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যে কাজ প্রশংসনীয় ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, যাহাতে দুই চারি জন কর্ম্মী হাত লাগাইয়া ছিলেন, যাহার বিশেষ প্রভাব চতুষ্পার্শ্বস্থ বনপর্ব্বতবাসী সমাজগুলির উপরে অনুভূত হইতেছিল, তাহা তোমার কর্ম্মীদের মধ্যে দুই একজনের বিবাহের ফলে বন্ধ হইয়া গেল বলিয়া যাহা লিখিয়াছ, তাহা পাঠে বিস্ময় বোধ করিলাম। বিবাহ করিলেই কি কাজের লোকেরা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়? বিবাহ করিলেই কি দামী লোকেরা অপদার্থে পরিণত হয়? সত্যই কি বিবাহ এমন একটা ব্যাপার, যাহার ফলে কর্ম্মীর কর্ম্মিত্ব যায়, মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ পায়? বিবাহ দ্বারা পৃথিবীতে একটী প্রাণীও কি লাভবান্ হয় নাই? বিবাহ কি একটী জীবকেও সবলতর ও সুন্দরতর করে নাই? বিবাহ

মাত্রেই কি মানুষের হাতের কড়ি, পায়ের বেড়ী? নির্দ্দিষ্ট একটী মূল্যবান্ কর্ম্মী বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই তোমাদের অঞ্চলের সকল সংগঠন-কর্ম্ম একেবারে থামিয়া গেল, ইহার কি অর্থ হইতে পারে? তবে কি এতকাল তোমরা কেহই কোনও কাজ কর নাই? তবে কি এতকাল ঐ একটী কর্ম্মীই নিজের বুকের পাঁজর জ্বালাইয়া সকল কাজ করিয়াছে, আর তোমরা তাহার শ্রমকে নিজেদের শ্রম বলিয়া চালাইয়া দিয়া কেবল নাম কিনিয়াছ আর বাহাদুরী নিয়াছ?

বিবাহ মানুষের স্কন্ধে নূতনতর দায়িত্ব এবং সাংসারিক কর্ত্তব্যবোধ চাপাইয়া দেয়। এই কারণে বিবাহের পরে কোনও কোনও সমাজ-কল্যাণ কর্ম্মীর সমাজ-সেবার কাজে একটু ঢিলা পড়িতে পারে। ইহা বিচিত্র বা অসম্ভাবিত ব্যাপার নহে। কিন্তু একজন দামী কর্ম্মী বিবাহ করিবার পরে সংসারের প্রতি মনোযোগী হওয়াতে এমন একটা সুন্দর সংগঠন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল, ইহা খুব যুক্তিসিদ্ধ কথা নহে।

আমার মনে হয়, গোড়া হইতেই প্রায় প্রতি জনে অপরের স্কন্ধে ভার রাখিয়া কাজ চালাইতেছিলে। নিজ নিজ ব্যক্তিগত দায়িত্বে তোমারা কোনও কাজ কর নাই। প্রায় প্রতি জনেই কাজ করাইয়াছ অন্য লোকের দ্বারা। কাজের সুফল ফলিয়াছে কিন্তু অন্য লোকেরা কখন হইতে ক্রমশঃ কাজে অমনোযোগী হইতেছিল, তাহা তোমরা ধরিতে পার নাই। মারফতী কাজের ইহাই প্রকৃতি। হঠাৎ যখন কাজ বন্ধ হইয়া গেল, তখন তোমরা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে, তাই ত', অমুক কর্ম্মীটী ত' বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া গিয়াছে!

কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ অঞ্চলের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শ্রীহট্টকে জোর করিয়া ভারত-রাষ্ট্রের বাহিরে ঠেলিয়া নিবার যে চেষ্টা দেশেরই শক্তিমান্ নেতা ও তাঁহাদের যশস্বী অনুচরেরা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অনেক নিরাপদ স্থান সামরিক দিক দিয়া অত্যন্ত বিপৎ-সঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে। এই সেদিন তোমরা দুর্গম অরণ্যে আর দুরারোহ পর্ব্বতে চালাইতেছিলে ধর্ম্মের অভিযান, আর আজ সমতলের সমীপস্থ স্থানগুলিও বিপজ্জনক বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এমতাবস্থায় এই নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলটায় তোমাদের কর্ম্ম-চেষ্টা সঙ্কুচিত এবং শক্তি খর্ব্বিত হইতে বাধ্য। সুতরাং এখন আর হায়-আফশোষ করিয়া লাভ নাই।

এখন তোমরা নিরাপদ ও সন্নিহিত স্থানে কাজ সুরু কর। এই সকল স্থানের কাজ গোড়া হইতেই অবহেলিত। খোঁজ করিলে দেখিতে পাইবে যে, তোমার পাশের বাড়ীর লোকেরাই হয়ত এতদিনে জানিতে পারেন নাই, তোমরা কোন্ আদর্শের পূজারী, কোন্ লক্ষ্যের পথিক, কোন্ সাধনার সাধক। যাঁহাদের বাদ দিয়া তোমার কোনও সামাজিক উৎসব বা অনুষ্ঠান চলে না, তোমার এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাই হয়ত জানেন না যে, কেন তুমি নির্দ্দিষ্ট একটা মত বা পথকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহারই অনুবর্ত্তন করিতেছ। এমন কি, ইহাও বিচিত্র নহে যে, তোমার পুত্র বা কন্যারা পর্য্যন্ত তোমার জীবনের কোনও উল্লেখযোগ্য রূপান্তর লক্ষ্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহাদের দশ বৎসরের আগেকার পিতৃদেব হইতে অদ্য তারিখের পিতৃদেবের মূলগত কোনও পার্থক্য ধরিতে পারে না। অর্থাৎ তুমি হয়ত নিজের ঘরের মরিচা-ধরা কুসংস্কারগুলি দূর

করিতে সমর্থ হও নাই। এখন যখন দেখিতেছ যে বাহিরের কাজের সুযোগ-সুবিধা নাগা-বিপ্লবের ফলে বিশেষভাবে ব্যাহত, তখন নিজের ঘরের, নিজের পাড়ার, নিজের ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সহরটুকুর করণীয় কাজে দ্রুত হাত দাও। শান্তিরক্ষাকারীরা নিজেদের সাধ্যমতন শান্তিরক্ষা করিবেন, ধর্ম্মপ্রচারকই বা কেন নিজের সাধ্যমত নিজের কাজ অবিচলিত বিক্রমে করিয়া যাইতে বিরত রহিবেন? অবিলম্বে তোমরা ঘরের পানে, পাড়ার পানে, নিজ পল্লী বা নগরের পানে তাকাও।

ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য শহর হইলেও তোমাদের স্থানটা যে শহর, এই অভিমান তোমাদের আছে। শহরের লোকেরা নিজেদিগকে জ্ঞানী গুণী, বিজ্ঞ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু কাজে নামিলেই দেখিতে পাইবে যে, শহরের লোকগুলি শিখিবার মধ্যে শিখিয়াছেন শুধু ভাল জামা, ভাল জুতা, ভাল সেমিজ, ভাল ব্লাউজ, ভাল প্যান্ট-কোট, ভাল শাড়ী ও ভাল কর্সেট পরিতে। এই জাতীয় শিক্ষায় তাঁহারা তাঁহাদের বনাঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রতিবেশীদের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জীবনের আসল শিক্ষা সম্পর্কে শহরের নগরজ্যেষ্ঠ হইতে সুরু করিয়া ময়লা-পরিষ্কারক মেথর-মুদ্দফরাস পর্য্যন্ত সকলে অবনতির একই নিম্নস্তরে বাস করিতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা উপার্জ্জক দ্বিতল-প্রাসাদ-বাসী ধনী ব্যবসায়ীর দাম্পত্য জীবনের সহিত নোংরা বস্তির অধিবাসী দরিদ্র ঝাড়ুদারদের দাম্পত্য জীবনের কোনও পার্থক্য নাই। সচ্চরিত্রতা, শুচিতা, আভ্যন্তর শুদ্ধি, সততা, প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম প্রভৃতি অত্যাবশ্যক মানবীয় গুণাবলী সম্পর্কে কার্য্যতঃ ইঁহাদের মধ্যে কোনও গুরুতর ব্যবধান নাই। পরের জিনিষ সুকৌশলে আত্মসাৎ করিবার প্রবৃত্তির হাত হইতে ইঁহারা প্রায় সকলেই নিজেদিগকে

রক্ষা করিতে সমান অক্ষম। ইহার কারণ যে অজ্ঞতা এবং অজ্ঞানতা, একথা তোমারা বুঝিতে সমর্থ হও। নাগা বিদ্রোহ যদি তোমাদের বন-পর্ব্বতের কাজগুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া দিয়া থাকে, তবু তোমাদের বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। তোমাদের সুসভ্য সুন্দর শহরটীর মধ্যেই অফুরন্ত কাজ করিবার রহিয়াছে। দূরের গ্রামের দুর্নীতি দূর করিতে যাইবার আগে তোমার বুক-পকেটে সযত্নে রক্ষিত রুমালখানার কফের ডেলাকে দূর কর, রুমালের দুর্গন্ধ নিবারণ কর, রুমাল হইতে যক্ষ্মাবীজাণুকে নির্ব্বাসন দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরি-ওঁ   পুপুন্‌কী আশ্রম

১০ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যানীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার বিবাহের তারিখ ঠিক হইয়া গিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, শুভাকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হউক এবং তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময়, তৃপ্তিময় ও সেবাময় হউক। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা উভয়ে সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া জগতের মঙ্গল-কাজে সুসার্থক হও।

অভিলষিত ও আদর্শবান বরের সহিত তোমার বিবাহ হইতেছে। ইহা কতই না সুখের। এতদিন সমাজ-কল্যাণ চিন্তা করিতেছিলে একা

একা, এখন হইতে দুই জনে মিলিয়া তাহা করিবে। চিন্তা খুব পুষ্ট ও পরিপক্ক না হইলে তাহা কর্ম্মে রূপায়ণ পায় না। একাকিত্বহেতু যে কর্ম্মে হস্তক্ষেপে অনেক সময়ে আদৌ সাহস পাও নাই, এখন তাহা স্বামীর সহিত সহযোগে অনায়াসে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। সাধারণ অবস্থায় বিবাহিত জীবনই নারীর কাম্যপথ। বিবাহিত জীবন তোমাকে কর্ম্মপথেও অগ্রগতি দিবে।

কুমারী-জীবনে অনেক শুভসংস্কার তোমার দ্বারা অর্জ্জিত হইয়াছে। তোমার বিবাহিত জীবনে সেগুলিকে কার্য্যকর রাখিতে চেষ্টিত হইও। নিজের সুখ বা স্বার্থ অপেক্ষা স্বামীর সুখ বা স্বার্থকে সকল সময়ে বড় করিয়া দেখিও। বিবেকবান স্বামীর স্ত্রীরা এইভাবেই অধিকতর লাভবতী হয়।

ভগবৎ-প্রেম, বিশ্বপ্রেম, স্বদেশপ্রেম ও পতিপ্রেম এই চারিটী বিভিন্ন রকমের প্রেমকে স্তরানুযায়ী পৃথক্ রাখিয়াও ইহাদের মধ্যে পূর্ণ একত্ব ও সামঞ্জস্য স্থাপনের যোগ্যতা অর্জ্জনই বিবাহিত জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মহনীয় দায়িত্ব। আমি জানি, তোমরা এই দায়িত্ব পালনে সমর্থ হইবে। আমি বিশ্বাস করি, বিবাহ তোমাদের দুইজনের পরিপূর্ণ ঐক্য স্থাপনের মধ্য দিয়া পরমেশ্বরের সহিত অভেদ-আত্মীয়তা স্থাপনে সমর্থ হইবে।

পুনরপি তোমরা উভয়ে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১১ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শিষ্য হইয়াছিলে বাংলা ১৩২৯ সালের এক অপরাহ্ণে। আজ প্রায় ছত্রিশ বছর পরে তোমার সহিত হইল পত্র-বিনিময়। এতদিন পরে তোমার পত্র পাওয়া কি যে আনন্দজনক ব্যাপার, তাহা হয়ত নিজের পত্রখানা লিখিবার সময়ে টের পাইয়াছ। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধে যে লয় নাই, ক্ষয় নাই, ছেদ নাই, ভেদ নাই, তাহা নূতন করিয়া প্রমাণিত হইল।

উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া তোমরা আসিতে আমার নিকটে ব্রহ্মচর্য্যের বাণী শুনিতে। আমি চাহিয়াছিলাম একদল জগৎকল্যাণকারী নিষ্কাম কর্ম্মী। ব্রহ্মচর্য্যের সাধন ছাড়া তেমন কর্ম্মী কেহ হইতে পারে না। তাই তোমাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিতাম। তোমরা অভিভাবকদের শাসন, গুরুজনদের ভ্রূকুটি, হিতৈষীদের তিরস্কার, প্রতিবেশীদের বিদ্রূপ অবহেলে সহ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতে স্কুল ছুটির পরেই গুরুসঙ্গ করিতে।

সেইদিনকার কত সুমধুর স্মৃতি আমার মনের মণি-কোঠায় সযত্নে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

সেইদিনকারই আমার এক নয়নের মণি আজ ছত্রিশ বৎসর পরে আমাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। আমার মনের মণ্ডপে আজ মহোৎসব লাগিয়া গিয়াছে।

আমার শরীর এখন বয়স্ক হইতেছে। তোমাদেরও জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ছিলে সংশিতব্রত ব্রহ্মচারী, এখন হইয়াছ গৃহীতদার সংসারী। সেদিন ব্রহ্মচর্য্যের ভাবকে যুবক-সমাজে প্রসারিত করা ছিল তোমার জীবনৈকলক্ষ্য, এখন তোমাকে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে নিয়া চলিতে হয়, সংসার দেখিতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নার্জ্জন করিতে হয়, কন্যার বিবাহের জন্য দুশ্চিন্তায় অধীর হইতে হয়, আত্মীয়-কুটুম্বদের মন রাখিবার জন্য কত প্রয়োজনীয় নিষ্প্রয়োজনীয় লৌকিকতার অসহনীয় ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। সেদিন ছিলে মুক্ত বিহঙ্গম আর আজ তুমি খাঁচার পাখী।

তবু তোমার অন্তরের আগুন নিবে নাই। ইহা কি সামান্য কথা? তবু তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও নাই। ইহা কি তুচ্ছ সংবাদ? এখনও তুমি আমাকেই তোমার হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়াছ। ইহা কি উপেক্ষার যোগ্য সামান্য একটা ব্যাপার? আমি ত' জীবনে কখনও তোমাদের কাছে নিজের পূজা চাহি নাই। তবু তোমরা আমাকে হৃদয়ের অধিরাজ করিয়া রাখিয়াছ। ইহার ভিতরে পরিচয় রহিয়াছে তোমাদের কোমল প্রাণের অপরাজেয় প্রেমের। ধন্য এই প্রেম, যাহা কাহাকেও ভুলিতে দেয় না।

সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে কেবলই ভাবিতেছ, বুঝি তোমার উদ্ধার নাই। কিন্তু ইষ্টে নিষ্ঠা আর নামে বিশ্বাস তোমার ত' কমে নাই! তোমাকে ডুবাইতে পারে কে? তেমন গভীর সমুদ্র এখনও সৃষ্টিই হয় নাই।

শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে আসিতেছি। তোমরা প্রতীক্ষা কর। আর, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকের যুব-জন-সমাজে প্রচারে ব্রতী হইয়া যাও যে,

ব্রহ্মচর্য্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া পথভ্রান্ত মানবতার হইবে নুতন করিয়া মুক্তিলাভ। দিকে দিকে ব্রহ্মচর্য্যের বাণী ছড়াও।

ছত্রিশ বৎসর আগে আমার লেখা পুস্তকের সংখ্যা অত্যল্প ছিল। হাতের লেখা চিঠিগুলি নিয়া তোমরা ঘরে ঘরে পড়িয়া শুনাইয়াছ। সেই চিঠিগুলি তোমরা নকল করিয়া করিয়া হাজার জায়গায় পাঠাইয়াছ। আজ কিন্তু তোমাদের একটা সুনির্দ্দিষ্ট ধরণের সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। আজ তোমাদের শ্রম করা কত সহজ। কিন্তু সেই দিন তোমরা যাহা ছিলে, আজ সেই রকম একাগ্রচিত্ত একলক্ষ্য কর্ম্মী কোথায়? তাই তোমাদের জীবনের প্রৌঢ়ে তরুণ কৈশোরের অভ্যস্ত কর্ম্মটীতে তোমাদিগকে হাত দিতে হইবে। আমি তোমাদের অঞ্চলে অবশ্যই অতি শীঘ্র আসিব, কিন্তু তাহার আগে তোমাদের অঞ্চলের প্রতিটি কিশোর এবং যুবক সংযম এবং ব্রহ্মচর্য্যের মহীয়সী বাণী শুনিয়া নিজেদের মনকে বৃহত্তর অধিকার অর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত করুক। জগৎকল্যাণ-সঙ্কল্প লক্ষ লক্ষ যুবক আজ চাই, যাহারা জীবনকে ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিমূলে গাঁথিয়া তুলিবে, যাহারা নারীমাত্রকেই মাতৃজ্ঞানে সম্মান করিবে, যাহারা নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তাড়নাকে বিবেকবলে নিঃস্তব্ধ করিয়া দিয়া সংযমসুন্দর জীবনযাপনে চতুর্দ্দিকের মরীচিকা-ভ্রান্ত সমাজকে আদর্শ দান করিবে, যাহারা কামের উপরে প্রেমের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া জগতের অশান্তি দমনে সহায়তা করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১২ই আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যে সকল পত্র তোমার সতীর্থদের নিকটে যাইতেছে, তাহা তোমার নিকটও লিখিত বলিয়া মনে করিও। আমি যখন রামকে বলিব "আলস্য পরিহার কর", তখন শ্যামেরও মনে করা উচিত যে উপদেশটা আমি শ্যামকেও দিতেছি।

নিকটবর্ত্তী যতগুলি উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয় আছে, প্রত্যেকটীর ছাত্রদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া যাও। তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের বহি দিয়া দিয়া পড়াইতে থাক। কোনও কোনও ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারক নিজেদের পুস্তকগুলির মধ্য দিয়া নিজেকে বা নিজের গুরুকে যুগাবতার এবং একমাত্র শরণ্য বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। আমাদের রচিত কোনও ব্রহ্মচর্য্য-পুস্তকে সেই সকল সঙ্কীর্ণতা নাই। আমাদের রচিত বহিগুলি আমাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিস্তার সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হয় নাই। আমাদের গ্রন্থাবলির প্রতিটী পংক্তির লক্ষ্য সর্ব্বসাধারণের অসাম্প্রদায়িক নিঃশ্রেয়স। কিশোর ও যুবকদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের ভাব প্রচারের চেষ্টায় নামিলে যাহারা ক্ষেপিয়া আসিয়া অভিযোগ করিবেন যে, তোমরা নিজেদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তীদের সংখ্যা বাড়াইবারই জন্য এই ফিকির ধরিয়াছ, তাহাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিবে যে, নিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তীদের সংখ্যা

বাড়ানোকে তোমরা কোনও চরম লাভ বা পরম পুরুষার্থ বলিয়া গণনা কর না। তোমাদের লক্ষ্য হইতেছে, মানুষের সন্তানকে প্রকৃত মানুষ করা। মানুষের বংশে জন্মিয়াও ছেলেগুলি অমানুষ না থাকিয়া যায়, ইহাই তোমাদের একমাত্র অভীপ্সিত।

ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের নাম করিয়া ভারতে নূতন কোনও অবতার প্রতিষ্ঠাও তোমাদের লক্ষ্য নহে। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে ঈশ্বর আছেন, প্রতিটি জীব রূপান্তরে পরমেশ্বরেরই এক একটী বিভূতি, কিন্তু সে নিজেকে তাঁহারই বিভূতি বলিয়া না জানিয়া কেবল অন্যান্য বিভূতিকে পূজা করিতে শিক্ষা পায়। এইভাবেই নিত্য-নূতন অবতার সব সৃষ্ট হয়। অবতারের শক্তি নিজের ভিতর বিকশিত না হওয়া সত্ত্বেও যাহারা নিজেদিগকে অবতার বলিয়া প্রচারিত দেখিতে আগ্রহী, এই দেশ এখন তাহাদিগকে চাহে না। অবতারের সকল শক্তি নিজের ভিতরে থাকা সত্ত্বেও যিনি সর্ব্বশক্তি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সাধারণ মানুষের সহিত সাধারণ ভাবে মিশিয়া তাহার অন্তরে এই অনুপ্রেরণা জাগাইয়া দিতে সমর্থ যে, যত জীব, তত শিব, একটী জীবও ভগবানের অবতার ছাড়া আর কিছু নহে, আজ প্রয়োজন তাঁহার। তোমরা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দাও যে, নূতন বা পুরাতন কোনও অবতারকে প্রচারের দ্বারাই সেই সুফল ফলিবে না, প্রত্যেকটী মানুষকে ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ এবং আত্মানুসন্ধানপরায়ণ করিয়া নিজের অবতারত্ব অনুধাবনের দিকে তাহাকে প্রেরণ করিলে যাহা ফলিবে। মানুষ নিজে যে কত মহৎ, মানুষ তাহা জানে না। সে যে ব্রহ্মের সহিত অভেদ, তাহা তাহার ধারণায় আসে না। সে যে ঈশ্বর হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাহার ভিতরে যে ঈশ্বরেরই শক্তি বিরাজিত রহিয়াছে, ইহা সে

কল্পনাও করিতে পারে না। পরমেশ্বর যে তাঁহার পরিপূর্ণ মহিমা ও সমগ্র শক্তি লইয়া একটী তুচ্ছাতিতুচ্ছ আধারেও থাকিতে পারেন, এই প্রত্যয় তাহার নাই। এগুলি সবই তাহার অজ্ঞানতার ফল। তাহার অজ্ঞানতা কাটিয়া যাইবার সাহায্য তাহাকে কর। তখন সে নিজের ভিতরে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকে পূর্ণ সত্ত্বায় দেখিতে পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইবে। তখন সে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্যের সহিত নিজেকে অভিন্ন জানিয়া নিজের অবতারত্বে আস্থাবান্ হইবে। তখন আর তাহার জন্য নিত্য-নূতন যুগোপযোগী অবতার-সৃষ্টির প্রয়োজন থাকিবে না। তখন সে নিখিল বিশ্বে বিশ্বপতিকে এবং বিশ্বপতিতে নিজ আত্মাকে দর্শন করিয়া ভেদজ্ঞান-বিরহিত নির্ম্মলাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। জগতের প্রত্যেকটী মানুষকে এই পরম-মহীয়ান্ আস্বাদনের অধিকারী করাই তোমাদের লক্ষ্য হউক। যুগোপযোগী নূতন নূতন অবতারের সৃষ্টি, পৃষ্ঠপোষণ বা পূজা-প্রবর্ত্তন তোমাদের কাজ নহে। তোমরা যদি তোমাদের এই আসল উদ্দেশ্যের কথা স্মরণে রাখ, তাহা হইলে কাহারও অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নানা মিথ্যার সৃষ্টি ও প্রশ্রয়ের তোমাদের কখনও প্রয়োজন ঘটিবে না।

কিন্তু মুস্কিল হইতেছে এই যে, প্রখ্যাত অবতারগণের সমকক্ষ সুসন্তান প্রসবে যে আমাদের দেশের জননীরা সমর্থা, এই বিষয়ে নারীজাতিকে কোনও প্রত্যয় কেহ পরিবেশন করিতেছেন না। জননী জাগিলে সন্তান জাগিতে কতক্ষণ? প্রৌঢ় হইয়াও তরুণদের সহিত যেভাবে মিশিতেছ, পুরুষ হইয়াও জননীদের ভিতরে সেভাবে মিশিবার যোগ্যতা অর্জ্জন কর। মায়েদেরও প্রত্যয় জাগাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Created by Mukherjee TK, DHANBAD

(৭)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৩ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের উপাসনায়, কীর্ত্তনে, ধর্ম্মাভিযানে নিয়ত আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। এই বিশ্বাসটী অন্তরে রাখিয়া তোমরা প্রতিটি কাজ করিও। আমি সম্মুখে থাকিলে যেমন তোমরা ঝগড়া-কলহ দলাদলি হইতে বিরত হও, সর্ব্বসময়ে তাহাই করিও। যেখানে সত্যিকারের কর্ম্মী এবং ভক্তিমান সাধকেরা আছেন, সেখানে কলহ-বিসম্বাদ সত্যই অভাবনীয়। তোমরা প্রকৃত কর্ম্মী ও অকপট সাধক হইতে চেষ্টা করিও। যোগস্থ কর্ম্মী নিয়ত নিজের কাজের সঙ্গে ইষ্টকে দেখিতে পায়। অনলস সাধক বৃথা প্রসঙ্গে মন ও মুখ লাগায় না।

একটার পর একটা করিয়া স্মরণীয় ঘটনা তোমাদের ওখানে হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটাতেই তোমাদের ভক্তি, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও ত্যাগশক্তির পরিচয় দিয়াছ। তোমাদের সকলের সম্মিলিত প্রেম বাহিরের লোকের মনেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু তোমরা সেই প্রভাবকে স্থায়ী করিবার চেষ্টায় এখনো মনোযোগ দাও নাই। লোকের মনে বিস্ময় জাগিল বা শ্রদ্ধা আসিল, তোমাদের পর পর কতকগুলি উৎসবের অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের ইহাই মাত্র চরম ফল বলিয়া ধরিয়া নিলে তোমরা ঠকিবে। লোকের দেহ, মন, প্রাণকে জীবসেবায় টানিয়া আনিবার যোগ্যতা তোমাদের দেখাইতে হইবে।

কিন্তু সেই যোগ্যতা তোমরা এখনও দেখাইতে পার নাই। এই যোগ্যতা দেখাইবার সামর্থ্য যে তোমাদের নাই, এমন অন্যায় ধারণা

আমি করিব না। তোমাদের সম্পর্কে আমার ধারণা বরং ইহার বিপরীত। তোমাদের প্রতি জনের ভিতরে আমি অনন্ত সম্ভাবনা সমূহ দেখিতেছি। আর, তাহা দেখিতেছি বলিয়াই তোমাদের অগ্রগতির শ্লথতায় মর্ম্মদাহ অনুভব করিতেছি। তোমরা কি যে করিতে পার, তাহা তোমরা জান না। জান না বলিয়াই তোমরা এক একটা বিরাট বিরাট অনুষ্ঠান করিয়া লোক-মনে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াই ভাবিয়া বস যে, তোমাদের সব কাজ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত জনসমাজের সামগ্রিক রূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া নূতন জগৎ সৃষ্টির দায়িত্ব তোমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত। উৎসব, নগরকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, উপাসনা, প্রদর্শনী আদি এক একটা অনুষ্ঠানে অসামান্য বিশালত্ব ও অকল্পনীয় সাফল্য দেখাইয়াই যদি তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া যাও, তবে বড়ই ভুল করিবে। সমগ্র মানব-সমাজের নব-জন্ম-বিধান তোমাদিগকে করিতে হইবে। অন্ধ, আতুর, অক্ষমের জন্মদাত্রী দুঃখিনী ধরিত্রীকে কোটি কোটি ঈশ্বরকল্প বা অবতার-পুরুষের প্রসবিত্রীর গৌরবে গৌরবিনী তোমরা করিবে। তোমাদের দায়িত্বও ক্ষুদ্র নহে, কর্ত্তব্যও তুচ্ছ নহে।

তোমাদের দোষ-ত্রুটিগুলি আমি নিয়তই প্রদর্শন করিতেছি। ইহাতে তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বড়ই চটিয়া যাও। তোমাদের উষ্মা মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। তোমাদের কাহারও কাহারও দুর্বিনীত ক্রোধ গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধকে আঘাত করে। এইরূপ অসহিষ্ণুতা তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। তোমরা আমার পূর্ব্বদত্ত উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া আমাকে কেহ কেহ শুনাইয়া দাও যে, আমিই তোমাদিগকে বিদ্রোহ করিবার অধিকার দিয়াছি। ভুলিয়া যাও যে, আমি এখনও লোককল্যাণ-ব্রতকেই ধরিয়া রহিয়াছি। ভুলিয়া যাও যে, আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার যে পবিত্র অধিকার আমি তোমাদের দিয়াছি,

তোমাদের লোককল্যাণী অভীপ্সাই তাহার ভিত্তি হইবে। তোমাদের ব্যক্তিগত মান-অভিমান আর কৃতিত্বের অহমিকা হইতে উৎপন্ন যে বিদ্রোহ, তাহা তোমাদের সর্ব্বনাশ করিবে। তোমাদের গুরুদেব তোমাদিগকে কেন মহৎকৃতিত্বসম্পন্ন দুর্ল্লভ কর্ম্মী বলিয়া প্রশস্তি গাহিলেন না, কেন তিনি তোমাদের সংগঠন-কার্য্যের অপূর্ণতা এবং দুর্ব্বলতা সম্পর্কে অকুণ্ঠ সমালোচনা করিলেন, তোমরা যে তিন দিন আর চারি রাত্রি জাগিয়া উপাসনার মণ্ডপ সাজাইয়াছ, তোমরা যে সাতখানা গ্রামের লোক জড় করিয়া তাঁহাকে পথে-প্রান্তরে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছ, এই জন্য প্রকাশ্য সভায় তোমাদের সহস্র প্রশংসা করিবার পরেও ঘরে বসিয়া তোমাদের অন্যায় জেদের প্রতিবাদে কেন তোমাদের অযোগ্যতার প্রতি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া তোমাদিগের অভ্রভেদী অহংকে আঘাত করিলেন,—এই দুঃখে যাহারা বিদ্রোহী হয়, তাহাদের দ্রোহ তাহাদিগকেই চর্ব্বণ করিয়া নিঃশেষ করে। বিদ্রোহের অধিকার যে গুরু দিতে পারেন, তিনি বিদ্রোহের দায়িত্বও তোমাদের দিয়াছেন। এই অধিকার যেমন পবিত্র, এই দায়িত্বও তেমন পবিত্র। ব্যক্তিগত কৃতিত্বের অহমিকার মত অশুচি বস্তুর সহিত ইহার সংশ্রব-সৃষ্টি মূর্খতা। শিষ্যকে দ্রোহের অধিকার যে গুরু দিতে পারেন, তিনি যে ক্ষীণ, দুর্ব্বল, রুগ্ন ও অক্ষম গুরু নহেন, এই কথাটীও তোমাদের বিশ্বাসে থাকা প্রয়োজন। অজ্ঞ অন্ধ অহমিকার উপরে ভিত্তি করিয়া যে দ্রোহ, তাহার সহিত লোককল্যাণের কি সংশ্রব রহিয়াছে? তাহার সহিত আত্মোপলব্ধিরই বা সম্বন্ধ কি? তাহা দ্বারা কাহার কল্যাণ হইবে?

দ্রোহের সহস্র সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমি তোমাদের ত্রুটি দেখিলে তাহা অবশ্যই বলিব। কখনো স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিব, কখনো রুদ্র

গর্জ্জনে বলিব, কিন্তু বলিবার প্রয়োজন হইলেই বলিব। যাহারা সদাত্মা, তাহারা ইহাতে আত্মসংশোধনের পথ পাইবে। অবশ্য ইহা খুবই সুখের কথা যে, উল্লিখিত মনোভাব-সম্পন্ন অহংগর্ব্বী শিষ্য তোমরা সংখ্যায় অতি অল্পই আছ। কিন্তু রুগ্ন ভেড়া একটা থাকিলেই পালের সকল ভেড়ার ক্ষতি হইতে পারে। তাই এই সম্পর্কে দুই এক কণা সতর্কতারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমি আমার শাসন-কার্য্য প্রয়োজন অনুযায়ী অবশ্যই করিয়া যাইব। এক একটা বড় বড় অনুষ্ঠান করিয়া তোমরা সাফল্য অর্জ্জন করিবে আর তাহার ফল হইবে শুধু তোমাদের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের অহমিকা,—এই অবস্থা স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে। এক একটা অনুষ্ঠান জন-সমাজের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণের পরে কেন শত শত মানবের মনে নূতন দিগন্ত সৃষ্টি করিবে পারিবে না, তোমাদের নিকটে ইহা আমার কঠোর এবং ক্ষমাহীন প্রশ্ন। কেন তোমাদের শক্তি, অর্থ ও আয়ু কেবল সাময়িক হুজুগ সৃষ্টিতেই শেষ হইয়া যাইবে? তোমরা না জগৎকল্যাণের দীক্ষা পাইয়াছিলে? তোমরা না এই সঙ্কল্প নিয়া দীক্ষার আসনে বসিয়াছিলে যে, প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য লাভ তোমাদের লক্ষ্য, ব্রাহ্মণের জীবন জগৎকল্যাণের জন্য, তোমাদের সাধন-দীক্ষা কেবল মাত্র তোমাদেরই আত্মার মুক্তির উদ্দেশ্যে না হইয়া হইতেছে নিখিল বিশ্বের প্রতিটি আত্মার মুক্তি লাভার্থ, তোমাদের দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা আজ জগৎকল্যাণে হইতেছে সমর্পিত, তোমাদের প্রতি ইন্দ্রিয়, তোমাদের শরীরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জগন্মঙ্গল-সাধনার্থে হইতেছে প্রস্তুত? সে কথা আমি কেন তোমাদিগকে ভুলিয়া থাকিতে দিব? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

পুপুন্‌কী আশ্রম

হরি-ওঁ

১৩ই আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ঐ ক্ষুদ্র উপনিবেশটীতে একটী প্রাতঃকালে দেড়-দুই শত লোকের দীক্ষা হইয়াছিল তাহাদের সকলের নাম-ঠিকানা তোমাদের ওখানে রাখিয়া আসিয়াছি। ইহারা যে হুজুগে পড়িয়া দীক্ষা নেয় নাই, তাহা নির্দ্ধারণের সময় আসিয়াছে। অবিলম্বে ইহাদের প্রতিজনের সহিত সংযোগ স্থাপন কর। ইহাদের প্রতিজনকে জিজ্ঞাসা কর যে, ইহারা প্রত্যহ নিয়মিত উপাসনা করিতেছে কিনা, আর যেই গ্রামে বা বস্তিতে দুই বা ততোধিক লোক দীক্ষিত আছে, সেখানে নিয়মিত ভাবে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা চলিতেছে কিনা।

অনুসন্ধানের ফল ইতিবাচকও হইতে পারে, নেতিবাচক হওয়াও বিচিত্র নহে। উভয় অবস্থাতেই ইহাদিগকে নিজ নিজ সাধনে অধিকতর নিষ্ঠাশীল হইতে প্রেরণা দিয়া আসিবে। দীক্ষা সত্যই নবজন্ম, তবে সকলের নিকটে নহে। দীক্ষালাভের পরে যাহারা সত্য সত্যই সাধন করিতে লাগিয়া যায়, মাত্র তাহারাই সদ্যঃ সদ্যঃ এই নবজন্মের সুখস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হয়।

যাহারা দীক্ষা নিয়াছে অথচ সাধন করিতেছে না, তাহাদের ঔদাসীন্যের কারণ অবিলম্বে বাহির করিতে হইবে। দারিদ্র্যবশতঃ

সাধ্যের অতীত শ্রম ও সময়ের অপচয় করিয়া যাহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাদের জীবন-সংগ্রামকে কি করিয়া আমরা সহজতর করিয়া দিতে পারি, সেই বিষয়ে উপায় উদ্‌ভাবনের দায়িত্ব দীক্ষিতেরও যেমন, আমাদেরও তেমন। যাহারা অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের উপহাসের ভয়ে উপাসনায় অবহেলা করে, তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ-উপহাস অগ্রাহ্য করিবার সকল শিক্ষা আমাদিগকেই প্রদান করিতে হইবে। যাহারা চিরকালের মজ্জাগত আলস্যদোষে অপহত হইয়া কর্ত্তব্য বুঝিয়াও উপাসনায় অবহেলা করে, জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাদিগকে উপাসনায় বসাইতে হইবে। যাহারা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাবহেতু পিছে সরিয়া থাকিতেছে, তাহাদের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-সঞ্জননেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মোট কথা, একটী ভ্রাতা বা ভগিনীও অপর কোনও ভ্রাতা বা ভগিনীকে উপাসনার ব্যাপারে অবহেলা করিতে দিবে না,—এইটী তোমাদের প্রতিজনের পণ হওয়া আবশ্যক। তাহাদের প্রতি তোমাদের প্রেম নিঃস্বার্থ হইলে তোমাদের বাক্য ও সঙ্গ দ্বারা তাহাদের টলটলায়মান চিত্ত এবং দোদুল্যমান মনকে সর্ব্বসংশয় ও অবহেলা হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ তোমরা হইবে, ইহা ধ্রুব জানিও।

তোমাদের প্রত্যেকের মনে এই সঙ্কল্প সদা জাগরূক থাকা প্রয়োজন যে, প্রতি জন প্রতি জনের সাধন-রুচি বৃদ্ধির চেষ্টায় সুদৃঢ় থাকিবে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে ব্যক্তিগত সাধনে এবং সমবেত উপাসনায় নিরন্তর উৎসাহ দিবে। পরস্পর পরস্পরকে এ ভাবে সাহায্য করাকে ব্রতস্বরূপ জ্ঞান করিবে। কাহাকেও উৎসাহ দিলে উৎসাহদাতারও যে

অশেষ উপকার হয়, এই বিশ্বাস রাখিবে। শতবার বলিলেও যাহারা সমবেত উপাসনায় আসে না, তাহাদিগকে সহস্র বার বলিবে। পূর্ব্ব সংস্কার, অন্তরের পাপাসক্তি, জীবিকার্জ্জনের অসততা বা জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা কাহাকেও কাহাকেও উপাসনায় আসিতে বাধা দিবে, ইহা সত্য। কিন্তু তোমরা তাহাদের অবহেলা বা ঔদাসীন্যকে নিন্দা করিবার জন্য তাহাদের অশুচি রুচি, কদর্য্য অভ্যাস, পাপপথে অর্থার্জ্জন বা অতি-দারিদ্র্য প্রভৃতি নিয়া নিন্দা, টিটকারী, অপবাদ বা অসম্মানজনক উক্তি পরোক্ষেও করিও না। কেননা, এই জাতীয় উক্তি তাহাদের সৎপথে আসিবার বাধাই সৃষ্টি করিবে। তোমাদের কাহারও কাহারও মধ্যে আমি এই সুলক্ষণটী দেখিয়া বড়ই তৃপ্ত হই যে, তোমরা অন্যান্য ভ্রাতা-ভগিনীকে সমবেত উপাসনায় আসিবার জন্য উৎসাহিত কর এবং নিজেরাও কোনও সমবেত উপাসনায়ই অনুপস্থিত থাক না। কিন্তু কাহারও কাহারও মধ্যে এই অস্বাস্থ্যকর মনোবৃত্তিও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা আসিল না বা আসিতে পারিল না, তাহাদের না আসার কারণ-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে অনেক অসদুক্তি করিয়া মানুষের মনে বৃথা বিরক্তি ও অযথা বিরুদ্ধতা সৃষ্টি করা হয়। এই সকল সম্পর্কে পত্র লিখিতে বসিয়া কেহ কেহ এমন অবমাননাকর কথা লিখিয়া বসে, যাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিয়া যায়। এই জাতীয় ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটিতেছে বলিয়াই আমি এই সম্পর্কে তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৩ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যানীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

বিভিন্ন স্থানে সমবেত উপাসনার স্তোত্র-কীর্ত্তনাদির সুরের নানা ব্যতিক্রম পাইতেছ, ইহা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। সুরশিক্ষার ক্ষমতা সকলের সমান থাকে না বলিয়া একই সুরশিক্ষকের নিকটে শিখিয়াও ভিন্ন ভিন্ন জনে ভিন্ন ভিন্ন রূপ করিয়া থাকে। এইজন্যই স্বরলিপি করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তোমাদের সমবেত উপাসনার সুনির্দ্ধারিত সুরের স্বরলিপি-বহি ছাপানোই আছে। প্রত্যেক স্থানে একজন লোক সেই স্বরলিপির সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিলে স্বল্পতম ত্রুটির মধ্য দিয়া সে অপরাপরকে শিখাইতে পারে। কিন্তু যাহারা শিখিবে, তাহাদের শিখিবার চেষ্টাটা অকপট ও অভিমান-বর্জ্জিত হওয়া উচিত। অনেক স্থানেই শুদ্ধ সুর শিক্ষার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে শিক্ষার্থীর উদ্ধত গোঁড়ামি, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভুল শিখিয়া তাহাকেই শুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়া অনেক সময়ে বিশুদ্ধ-সুরক্ষম উপাসকের সহিত উদ্ধত-স্বভাব অজ্ঞেরা অনর্থক কলহও করিয়াছে।

স্বরলিপি-জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষাদাতাও দুই একজনকে লিড়ু হইতে দেরাদুন পর্য্যন্ত দুই হাজার মাইলব্যাপী স্থানে আমি ভ্রমণ করাইয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, ইহাতেও অভিলষিত সুফল পাই নাই।

একই ব্যক্তি গৌহাটী আর শিলং-এ শিক্ষা দিলেন কিন্তু এই দুই স্থানের উপাসক ও উপাসিকারা সমবেত উপাসনা কালে দুই রকম করিয়া সুর আবৃত্তি করিলেন। ইহার এক মস্ত কারণ এই যে, যাঁহারা সুরশিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ কাণে যে যেমন শুনিয়াছেন, তিনি তেমনই মনে রাখিয়াছেন, স্বরলিপির জ্ঞান না থাকায় কেহই নিজের শিক্ষাকে স্বরলিপি-পুস্তকের সহিত মিলাইয়া দেখেন নাই বা দেখিতে পারেন নাই।

স্বরলিপির ব্যাপারেও একটা বিঘ্ন আছে। ধীর লয়ে গাহিলে সুর যাহা হয়, দ্রুত লয়ে গাহিলে সুর তাহা অপেক্ষা সামান্য একটু বিভিন্ন হইয়া যায়। স্বরলিপি দেখিয়া করিলেও অনেক সময়ে ইহা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ধীর লয়ে যেইটুকুকে গা-মা-পা গামা গাহিতে হয়, দ্রুত লয়ে হয়ত তাহাই গা পামা গাহিয়া যাইতে হয়। লয়ের পার্থক্যে মধ্যবর্ত্তী স্বর দুই একটী কখনো বাদ দিয়া দিতে হয়। ইহার ফলে সাধারণ শ্রোতার কাণে দুইটীকে আলাদা সুর বলিয়া ঠেকে। হাজার হাজার উপাসক উপাসিকা নিয়া উপাসনা করিতে গেলে সুর ধীর লয়েই ভাঁজিতে হয়, নতুবা বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। অল্প লোক লইয়া সমবেত উপাসনা করিতে হইলে অতি ধীর লয় বিসদৃশ ঠেকে। কিন্তু লয় ধীর, অতি ধীর, দ্রুত, অতি দ্রুত যাহাই হউক, একটী আধটী স্বর মধ্যপথে যুক্ত বা পরিত্যক্ত হইয়া গেলে সুর অশুদ্ধ হইয়া যায় না। লয় ঠিক রাখিয়া গাহিয়া গেলে আদি, মধ্য ও অন্তে স্বরের মিল আসিয়াই যায়। তোমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই লয়ের দিকে লক্ষ্য থাকে না। ফলে ব্রহ্মগায়ত্রী ধী-ই-ম-হি কে ধী-ই-ম-অ-হি-ই গাহিয়া থাক। ইহাতেই অসুবিধা ও অসৌন্দর্য্য হয় সকলের চেয়ে বেশী।

বহুস্বনা (microphone) ও গর্জ্জনা (loud speaker) সহযোগে যেখানে সমবেত উপাসনা হয়, সেখানে যিনি উপাসনা পরিচালন করেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই উচ্চ হইয়া সর্ব্বত্র শ্রুত হয়। অন্যেরা সেই কণ্ঠের সহিত মিল রাখিয়া স্তোত্রাদি গাহিয়া গেলে বিশৃঙ্খলা অতি অল্প হয়। কিন্তু এই জন্য দুইটী সর্ত্ত পূরণ আবশ্যক। প্রথমতঃ, যিনি উপাসনার পরিচালক হইবেন, তাঁহার শুদ্ধ সুর ও শুদ্ধ লয় জানা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, অপরাপর উপাসক-উপাসিকাদের অন্তরে এই গর্ব্বের অভাব থাকা আবশ্যক যে, পরিচালককে লঙ্ঘন করিয়াও নিজেদের ইচ্ছামত সুর টানিয়া যাইতেই হইবে। এই দুইটী সর্ত্তপূরণ হইলে লক্ষ লোক মিলিত হইয়া সমবেত উপাসনা করিলেও তাহা শ্রুতিকটু বা মনের নিরানন্দতা-বিধায়ক হইতে পারে না।

যেখানে বহুস্বনা ও গর্জ্জনার ব্যবহার হইতেছে না, সেইখানে ত' উপাসনা-পরিচালকের কণ্ঠস্বরের দিকে প্রত্যেকের একাগ্র লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ, ইহা দ্বারা নিজেদের ভুল সংশোধন করিয়া শুদ্ধ ভাবে উপাসনা গাহিয়া যাইবার অভ্যাসটী জন্মিয়া যায়। সমস্ত দিন দীক্ষা, বক্তৃতা, দর্শনদান, পত্রলেখা, প্রুফ দেখা, প্রশ্নোত্তর প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে ক্লান্ত হইয়া যাইবার পরেও আমি অনেক স্থানে নিজেই সমবেত উপাসনা পরিচালন করিয়া থাকি। স্থানীয় উপাসক-উপাসিকারা তাঁহাদের সহিত আমাকে হয়ত এই অনুষ্ঠানটীতে পাঁচ বা দশ বৎসর পরে পাইলেন। আমি নিশ্চয়ই আশা করিব যে, যাহারা সুর সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে জানে না, তাহারা আমার কণ্ঠের সহিত মিল রাখিবার চেষ্টা করিতে গিয়া উপাসনারও গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধন করিবে, নিজেদেরও অভ্যাসটীকে সুন্দর করিবে। কিন্তু তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল অসংযত মাত্রাহীন

চীৎকারে আমার কণ্ঠ ডুবিয়া যায়, বহুস্বনার স্বর-বিকার ঘটে, গর্জ্জনার মধ্য দিয়া অসুন্দর কলরব চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে থাকে আর এতগুলি লোকের এক এক স্থানের এক এক রকম ভুলের হট্টাগোলে আমাকে একেবারে চুপ মারিয়া যাইতে হয়। ফলে উপাসনার আনন্দ যাহা হইতে পারিত, ঠিক তাহা আর হইয়া ওঠে না। সাধারণতঃ উপাসনা-কালে আমার কণ্ঠ গম্ভীর হইয়া থাকে কিন্তু নিজ নিজ কৃতিত্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত উচ্চ ধারণা বশতঃ তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমার সুদূরগামী গম্ভীর কণ্ঠকে ডুবাইয়া দিয়া যথেচ্ছ সুরে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে চেষ্টা কর। ইহার ফলে শুদ্ধ সুর শিখিবার কত কত উৎকৃষ্ট সুযোগ তোমরা হারাইয়াছ, হিসাব করিলেই বুঝিতে পারিবে। অথচ শুদ্ধ সুর নির্ভুল কণ্ঠ হইতে শোনার তোমাদের কত প্রয়োজন!

উপাসনার সুরশিক্ষা তোমাদের পক্ষে একটা সমস্যার রূপ পাইয়াছে। এই সমস্যার সমাধানে তোমাদেরই আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। অন্তরে প্রেম থাকিলে চেষ্টায় তোমরা সফল হইবে। অহঙ্কার, অভিমান এবং নিজের কৃতিত্ব তথা গুণবত্তা সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত উচ্চ ধারণা থাকিলে সফলতা সুকঠিন। অহঙ্কার যে কত রকমে মানুষের মনকে কলুষিত করে এবং পরিণামে মহৎ কর্ম্ম পণ্ড করে, তাহার কি কোনও পারকূল আছে? কেহ রূপের গর্ব্বে প্রাধান্য চাহে, কেহ ধনের গৌরবে কৌলীন্য দাবী করে। কেহ বিদ্যার বহর দিয়া অহংকারের অবিদ্যাকে পূজা করে। কেহ বা কণ্ঠের মাধুর্য্যকেই সুরজ্ঞতা বলিয়া ভ্রম করে। উপাসনায় বসিয়া অহঙ্কারের অনুশীলন বড় অযুক্তিযুক্ত ব্যাপার। তোমরা অভিমানবর্জ্জিত বিনীত মন লইয়া উপাসনা-সম্পর্কিত প্রতিটি কাজ করিও। তাহা হইলেই উপাসনার

সুরশিক্ষা আর সমস্যা হইতে পারিবে না। মানুষের অহঙ্কার উপাসনার অনুষ্ঠান-কালে পর্য্যন্ত কত অবাঞ্ছনীয় মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে শুনিলে তোমরা অবাক্ও হইবে, দুঃখিতও হইবে। কোনও কোনও স্থানে উপাসনার মাঝখানে পুরোবর্ত্তীদিগকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া পিছন হইতে একদল লোক আগে বাড়িলেন। কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা বিশুদ্ধতর সুর জানেন। অহঙ্কারের ইহা এক অতি অশুচি মূর্ত্তি। তোমরা এই জাতীয় অশুচিতা হইতে দূরে থাকিও। অহঙ্কারে যাহাদের মন এত অপবিত্র হইতে পারে, তাহাদের কি উপাসনা হয়? "বন্দে সদা" গাহিতে গাহিতে তাহারা ব্রহ্মগুরুর বন্দনা না করিয়া কেবল নিজেদের অহঙ্কারেরই বন্দনা করে। ইহা নিশ্চিতই এক শোচনীয় অবস্থা। এই দুরবস্থা হইতে তোমরা নিজেদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে মুক্ত রাখিও।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৩ই আষাঢ়, ১৩৬৫

হরি-ওঁ

কল্যানীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রীমান নিবারণের বাড়ী মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবিগ্রহ-স্থাপন হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। তোমারা তাহার গৃহে সদলবলে যাইয়া

উপাসনাতে যোগদান করিয়াছ জানিয়া সুখী হইয়াছি। যাহারা অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিয়াও এমন পুণ্যানুষ্ঠানে যোগদান করিতে বিরত রহিয়াছে, তাহারা ভুল করিয়াছে। মানুষের অধিকাংশ ভুল অহমিকা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, সকলের সেই অহমিকা দ্রুত বিনাশপ্রাপ্ত হউক, যাহা নিয়ত এক ভুল হইতে অন্য ভুলে তাহাদিগকে চালিত করে। অহমিকা কমিলে, বিনয় আসিলে অপরের আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সহজ হয়। তখন অপরের পুণ্যকার্য্যে অংশ লইতে প্রাণ উৎফুল্ল হয়। কাহারও সহিত কোনও কারণে মতের পার্থক্য আছে বলিয়াই তাহার আরব্ধ পুণ্যজনক কর্ম্মে অংশ নিব না, ইহা অতি মারাত্মক রকমের অভিমান। রথযাত্রার মতন এক পুণ্যদিনে সমবেত উপাসনা হইতেছে, এমন অবস্থায় ত' বিনা নিমন্ত্রণেও সকলের গিয়া জয় জয় ব্রহ্মপরাৎপর গাহিয়া মনঃপ্রাণ স্নিগ্ধ করা সঙ্গত ছিল।

কেহ কোনও মণ্ডলীতে কর্ত্তৃত্বের স্থান অধিকার করিলে তাঁহার উপরে সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও আসিয়া যায়। মণ্ডলীর সভাপতি বা সম্পাদককে অপর সদস্যেরা একজন আদর্শ পুরুষ রূপে দেখিতে চাহে। তাঁহাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, বাক্‌সংযম, সত্যশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও আর্থিক সততা তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করে। প্রতি জনে প্রতিটি কর্ম্মে তাঁহাদের সূচনী প্রতিভা (initiative) আশা করে, অর্থাৎ সকল ভাল ভাল কাজ তাঁহারা আগে আরম্ভ করিবেন, ইহাই থাকে সদস্য-সাধারণের প্রত্যাশা। কোথাও এই প্রত্যাশায় আশাভঙ্গ হইলে সদস্য-সাধারণ মুখে কোনও মন্তব্য করুক আর না করুক, তাহাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা কর্ত্তৃত্বাভিষিক্ত ব্যক্তিদের উপর হইতে সরিয়া যায়। এই কারণেই ইঁহাদের সতর্ক হইয়া চলা উচিত। কিন্তু এই সকল ব্যাপার

নিয়া তোমরা যাহাতে নিজেদের মধ্যে কোন কোলাহল সৃষ্টি না কর, কলহ-চর্চ্চাদিতে না রত হও, তাহা একান্তই প্রয়োজনীয়। কোনও স্থানেই মণ্ডলী এক দিনে খুব উচ্চ অবস্থায় পৌঁছিতে পারে না। তাহার জন্য ধারাবাহিক চেষ্টার প্রয়োজন। অনেক সময়ে অত্যন্ত নিকৃষ্ট উপকরণ দিয়াই উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন তৈরী করিতে হয়। প্রয়োজন তাহাই দাবী করে এবং উৎকৃষ্ট রন্ধনকারীরা প্রায় ক্ষেত্রে তাহাই করিয়া থাকেন। এই অসাধ্য সাধিত হয় একমাত্র প্রেমের বলে। তোমরা প্রতি জনে প্রেমিক হও। ইহা তোমাদের সকলের আগেকার প্রয়োজন।

লিখিয়াছ, একদা আমি ঘুমন্ত একটা বিরাট ভূখণ্ডে ধর্ম্মের প্লাবন আনিয়াছিলাম, সেই প্লাবনের স্রোতে অনেক আবর্জ্জনা সরিয়া যাওয়াতে অতি ন্যক্কারজনক মৃত্তিকায় আজ সুরভি কুসুম ফুটিয়াছে এবং তাহারই সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মসংঘের পর ধর্ম্মসংঘ সেই সেই অঞ্চলে সহজতর চেষ্টায় নূতন নূতন ধর্ম্মোদ্দীপনা সৃষ্টি করিতেছেন। আমি উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করিয়াছি কিনা, তাহার বিচার করিবেন মহাকাল। এখনো সেই সম্পর্কে কোনও অভিমত প্রকাশের সময় আসে নাই। অকপট সেবাও অনেক সময়ে যুগের প্রয়োজনের সহিত তাল রাখিয়া পা না ফেলিতে পারিলে মহাকালের বিচারে মৃত্যুদণ্ড পায়। আমার সেবা আধুনিক সময়ের দৃষ্টিতে কোথাও কোথাও ব্যাপক যে না হইয়াছে, তাহা নহে। কোথাও কোথাও তাহা গভীরও হইয়াছে। কিন্তু আরও যাঁহারা সেবক আছেন বা আসিবেন, তাঁহাদের সেবাধিকার ইহাতে লুপ্ত হইয়া যায় না। গণ-নারায়ণকে সেবার অধিকার প্রত্যেকের এবং যেখান দিয়া যিনি

যেভাবে যতটুকু সেবা মানব-সমাজকে দিয়াছেন, দিতেছেন বা দিবেন, তাহাকেই আমরা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে বাধ্য। কোথাও কোনও সংঘ আমার প্রবর্ত্তিত কোনও সদাচারের অনুসরণ করিয়া থাকিলে উহাতে আমার কৃতিত্বকে না দেখিয়া দেখিব তাঁহাদের কৃতিত্ব, যাঁহারা নিজেরা প্রাচীনত্বের গর্ব্বী হইয়াও নূতনের ভালটুকু গ্রহণে কুণ্ঠা করেন না। প্লাবন! তুমি স্বাগত। যেই দিক্ দিয়া যেই সংঘই মানব-মনের ঊষর মরুভূমিতে ভগবৎ-প্রেমের প্লাবন আনিবেন, তাঁহারাই নমস্য।

গভীর আত্মানুসন্ধানের দ্বারা আমি একটী সত্যের সাক্ষাৎকার পাইয়াছি। সেই একটী সত্যের মধ্যে আমি বিশ্বের সকল সত্যকে দর্শন করিয়াছি। সকল আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক সত্য একটী অনির্ব্বচনীয় মহাসত্যের মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে বলিয়াই আমি শত মত ও শত পথের বিস্তারকারীদিগকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া গণনা না করিয়া আমার সতীর্থ, আমার সহকর্ম্মী, আমার সহযোগী বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী আশ্রম

১৩ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রে কতক বিষয় অবগত হইলাম। মনে হইল, তুমি

তোমার মানসিক দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে এমন কোনও হেয় কাজ করিয়া ফেলিয়াছ, যাহার জন্য তোমাদের মণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্য তোমার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছেন। অথচ তুমি নিজে সত্যই অনুতপ্ত হইয়াছ এবং অনুরূপ দুর্ব্বলতা আর কখনও তোমাকে অভিভূত না করিতে পারে, তৎকল্পে সঙ্কল্পবান্‌ও হইয়াছ।

এমতাবস্থায় সকলের সহিত তোমার স্বচ্ছন্দ ও কুণ্ঠাহীন মিলনের আর বাধা রহিল কোথায়? তুমি মণ্ডলীর সকলকে ডাকিয়া তাঁহাদের নিকটে অকপটে নিজের ত্রুটি স্বীকার কর এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইয়া চলিবে বলিয়া সকলকে আশ্বাস দাও। কেহ কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়াও যদি সরল মনে নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া ভবিষ্যতে ত্রুটিহীন জীবন-যাপন করিবে বলিয়া অকপট আশ্বাস দেয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ক্ষমা অর্জ্জন করা কঠিন ব্যাপার নহে।

মানুষ মাত্রেই কখনও না কখনও কোনও না কোনও দুর্ব্বলতার কাছে নতি স্বীকার করে, যতক্ষণ না তাহার ব্রহ্মদর্শন হয়। মানুষের এই দুর্ব্বলতার কথা প্রত্যেক মানুষই জানে। আজ যাহারা তোমাকে শাসন করিতেছে, লোকচক্ষুর সতর্কতা না থাকিলে তাহারাও অনেকেই অনুরূপ ভুল করিতে পারিত। ইহা তাহাদের অনেকে বুঝে। এই কারণেই প্রকৃত অনুতপ্তকে সকলেই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। ঋণ, ব্রণ এবং কলঙ্কের দাগ আস্তে আস্তে এক দিন মুছিয়া যায়, যদি চেষ্টা থাকে উদ্যত। তুমি তোমার সাময়িক লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইও না। যে ভুল করিয়াছ, তাহা আর করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর এবং এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য যতটা সতর্কতা

অবলম্বন আবশ্যক, তাহা কর। ঘর পুড়িলে বা নদীতে বাড়ী ভাঙ্গিলে মানুষ নূতন করিয়া ঘর বাঁধে, চিরজীবন কেবল হা-হতোহস্মি করিয়া কাঁদিয়া বেড়ায় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২)

হরি-ওঁ পুপ্‌নকী আশ্রম
১৩ই আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

স্বামীর সহিত একই দিনে এক সঙ্গে দীক্ষা না নিলে সাধনায় কোনও সিদ্ধি অর্জ্জন সম্ভব নহে বলিয়া যে কথা শুনিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন। কারণ, অনেক সময়ে দীক্ষা গ্রহণের অনেক পরে স্বামী বিবাহ করিয়া থাকেন। এই সকল স্থলে স্বামি-স্ত্রীর একত্র দীক্ষা কি করিয়া সম্ভব হইবে? স্বামী তাঁহার কৈশোরে দীক্ষা নিয়াছিলেন বলিয়া কি যৌবনে বা যৌবনান্তে বিবাহিতা পত্নীর দীক্ষা মিথ্যা হইয়া যাইবে?

আসল কথা এই যে, যেখানে সম্ভব, স্বামী ও স্ত্রীর একত্র দীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করাই ভাল। যেখানে স্বামী আগেই দীক্ষা নিয়াছেন, সেখানে স্ত্রী পরেই দীক্ষা নিবেন। যেখানে অদীক্ষিত স্বামীর পক্ষে দীক্ষা নিবার সুযোগের অভাব অথচ প্রকৃত গুরুর সন্ধান মিলিয়া

গিয়াছে, সেখানে স্বামীর সানন্দ অনুমতি থাকিলে স্ত্রী তাঁহার আগেও দীক্ষা নিতে পারেন। যেখানে স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে মনোগত ধারণা ও আদর্শগত অনুধ্যানের পার্থক্য আকাশ-পাতাল, সেখানে, স্বামীর অনুমতি সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত কাল প্রতীক্ষা করিয়াও অনুমতি না পাইলে, পত্নীরা নিজেদের ইচ্ছামতও দীক্ষা নিতে পারেন। কিন্তু কোনও যুক্তিমান বিবেচক গুরুই এমন পত্নীকে এক কথায় দীক্ষা দিতে সম্মত হইতে পারেন না। কেননা, স্বামীর অনুমতি নিয়া দীক্ষা নিলে স্ত্রীর পক্ষে সাংসারিক অশান্তি অনেক কমিয়া যায়।

আদর্শ ব্যবস্থাটা এই যে, স্বামী ও স্ত্রী সাধ্যপক্ষে একত্রই দীক্ষিত হইবে। একত্র দীক্ষিত হইবার ফলে স্বামি-পত্নীর মধ্যে অনুরাগের সাত্ত্বিকতা বৃদ্ধি পায় এবং উভয়ে গোড়া হইতেই একে অন্যকে সাধন-পথে নিরন্তর উৎসাহিত করিতে অধিকতর রুচিসম্পন্ন থাকে।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে, স্বামিপত্নীর একসঙ্গে দীক্ষাগ্রহণকে অত প্রশংসা কেন করা হইয়াছে। কিন্তু দীক্ষা নিবার পরে সাধনও করিতে হয়। তাহারই পক্ষে সিদ্ধি অর্জ্জন সম্ভব, যে সাধন করিবে একাগ্র হইয়া। স্বামী দীক্ষিত না হইলে স্ত্রীর নানা সাধন-বিঘ্ন উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু স্বামী দীক্ষিত না হইলেও যদি স্ত্রী দীক্ষিতা হন এবং প্রাণপণেই সাধন করিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধি অর্জ্জনকে রুখিবে কে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী আশ্রম
১৩ই আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি অভিযোগ করিয়াছ যে, আমি আমার নিজ শিষ্য-শিষ্যাদিগকেই মানুষ হইবার প্রেরণা দিয়া পত্র লিখিতেছি, অপরের শিষ্যদিগকে এই সকল প্রাণময় উপদেশ দিতেছি না এবং ইহা আমার সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গিমার পরিচায়ক।

কেহ কোনও অভিযোগ করিলে সাধারণ ক্ষেত্রে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া নিজের ত্রুটি সাধ্যমত নিরীক্ষণ ও সংশোধন করাই আমার রীতি। সুতরাং তোমার অভিযোগ-পত্রের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই ব্যাপারে নিজের দোষ যাহা প্রত্যক্ষ হইবে, তাহা আমি সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু আমি যদি আমার শিষ্য-শিষ্যাদিগকেই কোনও ভাল কথা লিখিয়া থাকি, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণ তাহা হইতে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় হিতোপদেশ সংগ্রহ করিয়া নিয়া নিজেদের শুভসাধনায় প্রয়োগ করিলে তার পথে ত' কোনও বিঘ্ন আমি এখনও আরোপণ করি নাই! তবে এই সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ কেন?

আমি আমার শিষ্যদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছি যে, তাঁহারা যেন সমবেত উপাসনা-কালে পূজা-পীঠে একমাত্র ওঙ্কার-বিগ্রহই রাখেন, অন্য বিগ্রহ যেন না রাখেন। কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী আদি দেবমূর্ত্তি বা বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ আদি

মহাপুরুষগণের পুণ্য ছবি রাখিতে আমি বারণ করিয়াছি। আমি বলিয়াছি যে, তাহাদিগকে একের মধ্য দিয়াই সব পাইতে হইবে এবং তাহারই ফলে একদিন সবার মধ্য দিয়া এককে মিলিবে। তুমি বলিতেছ যে, ইহা আমার সাম্প্রদায়িকতা। অপর কেহ হয়ত বলিবেন যে, ইহা হইতেছে চূড়ান্ত অসাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু তুমি যখন একটা অভিযোগ করিয়াছ, তখন তাহা মানিয়া লইয়াই আমি বলিতে চাহি যে, নিষ্ঠাই যখন সাধনার প্রাণ, তখন এই তুচ্ছ একটু সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োজন আমার অনুবর্ত্তীদের আছে। একটা শহরে হাজার হাজার লোকের বাড়ী থাকে। প্রত্যেক বাড়ীরই সীমানার একটা চিহ্ন থাকে। সীমানার এই চিহ্নকে সাম্প্রদায়িকতা মনে করা ভুল। সীমানার চিহ্ন যদি ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে চারিদিকের দৃষ্টি অবরুদ্ধ করে এবং পরিশেষে নিঃশ্বাস বায়ুকে পর্য্যন্ত আটক করিতে চাহে, তবেই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার যোগ্য হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৪ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চতুর্দ্দিকের সহস্র কোলাহল হইতে নিজেকে নিমেষে বিযুক্ত করিয়া একটী নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মানুধ্যানে নিবিষ্ট ভাবে ডুবিয়া

যাওয়ার কৌশল তোমাদের আয়ত্ত করিবে হইবে। আবার, লক্ষ লক্ষ ধ্যানমগ্ন যোগীকে কর্ম্মকোলাহলে ব্যুত্থান দিয়া একটী নিমেষের মধ্যে ত্রিলোকবিস্ময়কর বিরাট সমারোহে জাগাইয়া তুলিবার যোগ্যতাও তোমাদের সঞ্চয় করিতে হইবে। অন্তর্মুখিনতায় তোমরা হইবে সমুদ্র অপেক্ষা গভীর, বহির্মুখিনতায় তোমরা হইবে হিমাচল অপেক্ষা উচ্চ, নিবিষ্টতায় অণু, ব্যাপকতায় আকাশ। যাবতীয় বিরুদ্ধ গুণ যুগপৎ তোমাদের মধ্যে সমাবিষ্ট হইবে। ইহাই তোমাদের কাছে চাহি।

আজ হইতেই কাজে লাগিয়া যাও। এমন কাজে, যে কাজ তোমার অভ্যন্তরমুখিনী গতিকে করিবে তীব্র, একাগ্র ও অবিশ্রাম আর তোমার বহির্ম্মুখ বিস্তারকে করিবে নিয়ত-প্রসারণশীল, উদার, উন্মুক্ত ও উদ্দাম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৫ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

তোমার পরীক্ষা পাশের সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, পরবর্ত্তী পরীক্ষা সমূহে তোমার কৃতিত্ব উজ্জ্বলতর এবং সাফল্য মহত্তর হউক। এখনি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া যাও।

বিদ্যার্জ্জনে পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করিয়া সাধ্যমত অধিকতম বিদ্যা আহরণ তোমার এক্ষণে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু অর্জ্জিত বিদ্যা যাহাতে অবিদ্যার সামিল হইয়া ব্যর্থ হইয়া না যায়, তাহার জন্য তোমার প্রয়োজন নিজ আধ্যাত্মিক সাধনায়ও তালে তালে পা ফেলিয়া প্রত্যহ একটু একটু করিয়া আগাইয়া যাওয়া। তোমাদিগকে দিয়াছি আমি সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম। কর্ত্তব্যের একটী দিকে অনাদর করিয়া অপর দিকে অত্যাদর আমি সমর্থন করি নাই। সাংসারিক কৃতিত্ব আর আধ্যাত্মিক যোগ্যতা উভয়ই তোমাদের আহরণ করিতে হইবে সমবিক্রমে।

নিজ জীবনে সত্যের অনুশীলন করিবার সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলের মনেও সত্যানুসরণ-স্পৃহা জাগাইয়া যাইতে হইবে। পড়াশুনা এবং সদ্ভাব-প্রচারের কার্য্য উভয়ই তোমাকে একযোগে একভাবে চালাইয়া যাইতে হইবে। কলেজে ঢুকিয়া অনেক সমপাঠিনী পাইবে। যাহারা বয়সেই মাত্র বাড়িয়াছে, অন্তরের দিক দিয়া কোনও মহাভাবের পুঁজিই সংগ্রহ করে নাই। নিতান্ত বস্তুতন্ত্র, ইহমুখ ও অসার সংসারের মধ্যে পালিতা হইয়া ইহারা জীবনের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে দিব্যজ্ঞানের শুদ্ধ বার্ত্তা শুনাইবার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হইবে। যে যাহার ভাগ্য লইয়া জীবন সংগ্রামে জিতুক বা হারুক, এই মনোভাব লইয়া নিষ্ক্রিয় থাকিলে চলিবে না। তোমার নিজের জীবন-পথ-যাত্রা তুমি যেমন করিয়া জয়ধ্বনি-মুখরিত দেখিতে চাহ, ইহাদের সম্পর্কেও তাহাই

বিশিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া নিজেদের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে কার্য্যে রত হইবে না? তোমাদের যে শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতার যশ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা কি অবিরাম নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়াই নিজেকে সার্থক করিবে? তোমাদের করণীয় কি শেষ হইয়া গিয়াছে? তোমাদের সাধনার কি সমাধি হইয়া গেল?

বাধা পাইলে দমিয়া যাওয়া শক্তিমানের ধর্ম্ম নহে। বাধা পাইলেও কাজ করিয়া যাওয়াই বীরের ধর্ম্ম। বাধা অতি প্রবল হইলে সকল বাধার মূলোৎপাটন করিয়া সে অগ্রসর হইবে। তোমরা কি তাহা করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছ? একথা কি তোমাদের মনে জাগে নাই যে, এখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকার অর্থ আত্মপ্রতারণা?

পরমতে পরপথে বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা পোষণ না করিয়াও পূর্ণ বেগে নিজের মত প্রচার করা যায়। পরমতের পরপথের প্রতি আক্রোশ সৃষ্টি না করিয়াও নিজের পথে নিজের মতে অবিচলিত বিক্রমে চলা যায়। সকল মতাবলম্বীরা একই ঈশ্বরকে বিভিন্ন ভাবে ভজনা করিতেছেন, শ্রদ্ধার সহিত এই কথাটুকু মনে রাখিলে সকলকে অনাহত রাখিয়াই নিজের পথে দৃঢ়তার সহিত চলা যায়। তোমরা কিন্তু এই কথাটী বিশ্বাস করিতে পার নাই। পরমতে পরপথে সম্মানবোধ অব্যাহত রাখিবার প্রয়োজনে তোমরা নিজেদের মত-পথের কথা প্রচারে ঢিলা দিয়াছ। এই ভাবে ঢিলা দিবার কোনও আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত হেতু দেখিতেছি না।

তোমরা এখনও তোমাদের প্রকৃত দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহা বুঝিতে পার নাই। তোমাদের অনেকের জীবনের আচরণে যেমন তোমাদের মত-পথ দেদীপ্যমান ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না,

তেমনি আবার তোমাদের পৌরুষপূর্ণ প্রচারণার দ্বারা মানুষের মনে কোনও উল্লেখযোগ্য দাগ তোমরা কাটিতে পারিতেছ না।

আজও হাজার হাজার লোক তোমাদের ঐ সহরটার মধ্যেই রহিয়াছে, যাহারা এখনও গান্ধীর মত মহাত্মার, রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির, রামকৃষ্ণের মত মহাসাধকের নামই শোনে নাই। মানুষের অজ্ঞতা এত গভীর যে, একটু অনুসন্ধান করিলেই অবাক্ হইবে। এমত অবস্থায় তোমরা যদি মনে কর যে জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নূতন জ্ঞান বিতরণের তোমাদের প্রয়োজন নাই, তবে বড়ই বিপত্তির কথা। দশ জনের দেখাদেখি জনসাধারণ কেবল ভাল জামা-কাপড়ই পরিতে শিখিয়াছে, ভিতরে তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার আদিম কালেরই ন্যায় একেবারে শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। এমন কি, শিক্ষাভিমানী যেই সকল ভদ্রলোকদের বাড়ীতে সোনার জলে নাম লেখা চামড়ার বাঁধাই আলমারি-ভরা কত পুঁথি-পুস্তক দেখিতে পাও, অনেক ক্ষেত্রে খোঁজ নিলে দেখিতে পাইবে যে, জ্ঞান ও বিদ্যা সেখানে মলাটের নীচে ঘোমটা টানিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, গৃহস্বামী বা গৃহবাসীদের কাহারও হৃদয়-দুয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। মানুষকে যত প্রাজ্ঞ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহারা তত প্রাজ্ঞ নহে। তাহাদের কাছে জ্ঞানের কথা লইয়া তোমাদের প্রতি জনের যাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। নিজের জ্ঞানকে বিলাইবার জন্য নহে, অপরকে জ্ঞান বিতরণ করিয়া নিজের জ্ঞানকে পাকা করিয়া নিবার জন্য তোমাদের ঘরে ঘরে অভিযান নিয়া যাইতে হইবে। এই মহৎ কর্ত্তব্য কেন তোমাদের মধ্যে একটী প্রাণীও বিস্মৃত হইয়া থাকিবে? কেন তোমরা একটী ভ্রাতা বা একটী ভগিনীকেও অলস, উদাস, নিষ্ক্রিয়

হইয়া বসিয়া থাকিতে দিবে? কেন তোমরা প্রতি জনের সমগ্র কর্ম্মশক্তিকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিবার জন্য এখনই চেষ্টায় নামিবে না? কেন আমি আমার একটী পুত্র বা একটী কন্যাকেও কর্ম্মবিরত ও সমাজের নিম্নতর স্তরের লোকদের প্রতি সহানুভূতি-বিবর্জ্জিত দেখিতে বাধ্য হইব?

রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যারিষ্টারেরা দলে দলে আমার কাছে উপদেশ নিতে আসে নাই। আসিয়াছে তোমাদেরই মত মধ্যবিত্ত অবস্থার কতকগুলি অর্দ্ধভুক্ত অর্দ্ধশিক্ষিত ছেলেমেয়ে। কিন্তু তোমাদের অপেক্ষাও শতগুণ হেয়, শতগুণ অশ্লাঘ্য অবস্থায় কোটি কোটি নরনারী পাপের পঙ্কিল আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। অজ্ঞানতা নিয়ত ইহাদিগকে পায়ে ধরিয়া টানিয়া নীচে নামাইতেছে। যে আজ দরিদ্র, কাল সে দরিদ্রতর, যে আজ পাপী, কাল সে পাপিষ্ঠতর হইতেছে। ইহাদের মধ্যে তোমাদের অবিলম্বে ছুটিয়া যাইতে হইবে। তোমাদের ক্ষুদ্র শক্তি, সামান্য সুযোগ, স্বল্প অবসর ইহাদের জন্য নিয়োগ করিতে হইবে। একাকী কেহ কোনও মহৎ বা বৃহৎ কাজ সমাধা করিতে পারে না বলিয়াই তোমাদিগকে সকলের সর্ব্বশক্তি একত্র কেন্দ্রীকৃত করিয়া কাজে নামিতে হইবে। কেন তোমরা ইহাতে বিলম্ব করিবে?

তোমাদের কি লক্ষ্যে ইহা পড়িতেছে না যে, একটা সহরের মাত্র দুই তিন লক্ষ লোকের ভিতরে প্রতিটি সপ্তাহে প্রকাশ্য ভাবে পাপাচরণের পরিমাণ কি ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে? পনের দিন আগে যে কাজে লোকে লজ্জাবোধ করিত, আজ তাহাই নির্ল্লজ্জ বেহায়ার মত করিয়া যাইতেছে মুখের হাসিতে দুই পাটি দাঁত বাহির করিয়া

সকলকে দেখাইতে দেখাইতে। কিসের ইহা পরিণাম? অজ্ঞানতারই নহে কি?

তোমরা এখনো কাজে লাগ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৫ই আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি তোমার পুত্রদের বিষয় লিখিয়াছ। তাহাদের পড়াশুনার যোগ্য ব্যবস্থা করিতে অক্ষম হইয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, ভগবৎকৃপায় এমন কোনও সুযোগ তোমার উপস্থিত হউক, যাহার দরুণ তোমার উপর হইতে চাপ অনেকটা কমিয়া যায় এবং পুত্রদ্বয়ের পড়াশুনা ভালভাবে হইতে পারে।

সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য রাখিও ইহাদের চরিত্রের উপর। সেই শিক্ষা পিতামাতাই দিবেন। শিক্ষক-শিক্ষিকার দ্বারা সেই শিক্ষার অধিক প্রত্যাশা এই যুগে নাই। তোমরা নিজেদের চরিত্রের সবচেয়ে ভাল জিনিষগুলি পুত্রকন্যার মধ্যে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা পাইও।

স্বাবলম্বনের মধ্য দিয়া জনসমাজের সেবা করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া আমি ক্লান্ত না হইলেও বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছি। এখনও তোমাদের পুত্রকন্যাগণের জন্য তেমন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারি নাই, যেখানে তোমরা তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পার। আস্তে আস্তে তেমন প্রতিষ্ঠান অবশ্যই গড়িয়া উঠিবে কিন্তু বর্ত্তমানে তোমাদিগকে নিজ নিজ শক্তির উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। উপার্জ্জন তোমাদের যতই কম হউক, অভাবের মধ্য দিয়াই পুত্রকন্যাকে মানুষ করিয়া তুলিবার দিকে আপ্রাণ ত্যাগ স্বীকার করিয়া যাইতে হইবে। তবে একটী কথা কিছুতেই ভুল করিও না যে, কেবল কেতাবী বিদ্যা হইলেই পুত্রকন্যা মানুষ হয় না, তাহাদের চারিত্রিক অনুশীলন এবং আধ্যাত্মিক সাধনাও ইহার সঙ্গে চলা চাই। নির্ল্লোভ, স্বাবলম্বী, পরহিতকারী, সংযমী এবং আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিকেই প্রকৃত মানুষ সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

নিজ পুত্রকন্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের পুত্র-কন্যাদের মধ্যেও এই সকল উচ্চ চিন্তার পরিবেশন করিতে চেষ্টা পাইও। কারণ, উপযুক্ত পরিবেশ না পাইলে একা একা কোনও বালক-বালিকা নিজেকে উন্নতির দিকে দ্রুতগতিতে পরিচালিত করিতে পারে না। তাহার সঙ্গীদের ভালমন্দ তাহাকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৫ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রয়োজন জাগ্রত প্রহরীর, যাহার সতর্ক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়া একটীও অপরিচ্ছন্ন চিন্তা মনে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ব্যক্তির জন্য, জাতির জন্য, জগতের জন্য এইরূপ প্রহরীর প্রয়োজন। তোমরা প্রতি জনে প্রহরী হও। একজনেও মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া অপচিন্তার প্রবেশপথ সহজ করিয়া দিও না।

চারিদিকে জাগরণ আনিতে হইবে। এই কাজে তোমাদের প্রতি জনকে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রতি জনের বাসস্থানের দশ বিশ পঁচিশ মাইলের মধ্যে যে যেরূপ অবস্থায় পতিত মানবাত্মার সহিতই সাক্ষাৎকার করুক না কেন, তাহাকে উন্নততর অবস্থায় টানিয়া তুলিতে হইবে। পিপীলিকা বলিয়া কাহাকেও অনাদর করা হইবে না। ঐরাবত বলিয়া কাহাকেও বাদ দেওয়া চলিবে না। তোমাদের সেবা ছোট ও বড় সকলের জন্য।

অচিন্তিতপূর্ব্ব এক সংগঠনী প্রতিভার দ্বারা অভাবনীয় এক ভাবপ্লাবন সৃষ্টি করিয়া অভূতপূর্ব্ব এক জন-জাগরণ তোমরা আনিবে। তাহাতে জগৎ হইতে ছোট-বড়র বিভেদ-বিবেচনা লোপ পাইবে। তাহাতে সকলে সকলকে আপন বলিয়া জানিবে, চিনিবে, মানিবে। তাহাতে সকলে সকলের অভাব-বিদূরণের জন্য শ্রম করিবে, ত্যাগ স্বীকার করিবে। তাহাতে অতীতের অবিচারের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া

সকলে সকলের সহিত সমতার বন্ধনে আবদ্ধ হইবে, সমতার স্বীকৃতি দিবে। তাহাতে ভাল-মন্দ সকলের মহত্তম কল্যাণ ও বৃহত্তম সার্থকতার দুয়ার খুলিয়া যাইবে। অন্ধকারের সহিত আলোকের সুরু হইবে সংগ্রাম, যাহাতে শাশ্বত সত্যের পরমজ্যোতি হইবে বিজয়ী।

সেই সংগ্রামের তোমরা আমার সৈনিক।

তোমাদিগকে এই কথার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে হইবে। তোমাদিগকে সৈনিকের নিষ্ঠা, নির্দ্দেশ পালনে অকুণ্ঠ আনুগত্য, নির্ভীকতা অর্জ্জন করিতে হইবে।

তোমাদিগকে অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনের জন্য সহস্র সহস্র সমযোদ্ধা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

তোমাদিগকে বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেমে সুকরুণ, কোমল-হৃদয় অথচ কর্ত্তব্যপরায়ণ কঠোর কর্ম্মি-দল প্রস্তুত করিতে হইবে।

দায়িত্ব তোমাদের ছোট নহে। তোমরা তোমাদের দায়িত্বের উপযুক্ত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
১৫ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সমবেত উপাসনার মত জিনিষ উপলক্ষ্য করিয়া কাহারও সহিত কাহারও মনোমালিন্য হওয়াটা বড়ই শোচনীয় ব্যাপার। যেমন সময়ে

বা তারিখে কাহারও গৃহে গিয়া তোমাদের সকলের সমবেত উপাসনা করা সম্ভব নহে বলিয়াই তোমরা সমবেত উপাসনা করিতে যাইতে পার নাই, তেমন সময়ে পুনরায় কোথাও সমবেত উপাসনার জন্য আমন্ত্রণ হইলে সরল ভাবে বিশদ আলোচনা করিয়া যোগদানের অসম্ভাবনীয়তার কথা বুঝাইয়া দিও। হঠাৎ সহরব্যাপী একটা বড় রকমের ঘটনা স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ঘটিয়া গেলে তার সঙ্গে যুদ্ধ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জোর করিয়া সমবেত উপাসনা সফল করিবার চেষ্টা না করাই ভাল। এই সকল স্থলে আমন্ত্রণকারীকে বুঝ-প্রবোধ দিয়া তোমরা তারিখ বদল করিও।

কাহারও কাছ হইতে সমবেত উপাসনার জন্য আমন্ত্রণ আসিলে তোমরা তাহা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিও। কেহ তোমাদের গুরুভ্রাতা নহে, এই যুক্তি তুলিয়া এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা তোমাদের পক্ষে অতীব হীন সাম্প্রদায়িকতার পরিচায়ক হইবে। তোমাদের সমবেত উপাসনা বিশ্বের সকলকে লইয়া হইবে এবং হইতেছে বিশ্বের সকলের জন্য। এমতাবস্থায় কে কার গুরুভাই, কে কার গুরুভগ্নী অথবা কে কাহার কিছুই নহে, এই সকল অপরিচ্ছন্ন কথা আসিবে কেন? এই জাতীয় চিন্তা যে তোমাদের পক্ষে কেবল অশোভনই নহে, পরন্তু অমার্জ্জনীয়, তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তোমাদের থাকা উচিত। তোমাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধির অল্পতা বশতঃ এই জাতীয় সঙ্কীর্ণতা দেখাইবে, তাহাদিগকে হিতবচনে বুঝাইতে চেষ্টা করিও যে, ইহা তাহাদের অন্যায় হইতেছে। কেহ অন্যায় করিলে তাহাকে ফৌজদারী আসামীর মতন চাপিয়া ধরিও না। তাহার এই আচরণে তোমরাও যে অপরাধী হইয়া পড়িয়াছ, এই বোধটা

মনে রাখিয়া তারপরে তাহাকে উপদেশ দিবে। উপদেশ দান অনেক সময়ে দাতার দম্ভে ও গ্রহীতার মূর্খতায় পণ্ড হইয়া যায়। তাহার সম্ভাবনা বর্জ্জন করিয়া কাজ করিবে।

একই দিনে দুই তিন স্থান হইতে সমবেত উপাসনার আহ্বান আসিলে তোমরা স্থানীয় অবস্থা ও সাময়িক পরিস্থিতি বিবেচনায় সকলের পক্ষে সহজে গ্রহণীয় করিয়া কার্য্যতালিকা তৈরী করিবে। উপাসনা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক বা বিশেষ প্রয়োজন-সাধক না হইলে দুই তিন বা চারি জনের আলাদা আলাদা আয়োজন একটা কেন্দ্রবর্ত্তী স্থানে একত্র করিয়া বড় করিয়া একটী অনুষ্ঠানের চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয় হইবে।

অনেক সময়ে এক একটা সহরে সমবেত উপাসনার যেন একটা হিড়িক পড়িয়া যায়। আবার হয়ত ছয় মাসের মধ্যে কোনও স্থানে কোনও সাড়া-শব্দও পাওয়া যায় না। ইহাকে এক প্রকারের ভারসাম্যের অভাব বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই দুইটী বিপরীত অবস্থাকে কি করিয়া সুসমঞ্জস করিয়া পরিচালন করা যায়, তাহার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

দুই একজন শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনীর আচরণের দোষে শিক্ষিত, মার্জ্জিত, উচ্চাবস্থাপন্ন ভদ্রলোকদের গৃহে তোমাদের প্রবেশ-পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর হইয়া যাইতেছে, ইহা কি লক্ষ্য করিতেছ? অন্য দশ জন ভ্রাতা-ভগিনী যেই সকল গৃহে উপাসনায় গিয়া সকলের সঙ্গেই আনন্দ করে, সকলের সঙ্গেই আবার ভদ্রভাবে ফিরিয়া আসে, ইহারা সেখানে গিয়া হঠাৎ জোর করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করে, শুইবার ঘরে বিছানা পাতে, বিশ্রব্ধ আলাপ আলোচনার

মধ্যে গিয়া অনাবশ্যক মন্তব্য করে, আর করে নিজ নিজ গৃহের দূষিত ঘটনাবলির আলোচনা, যাহার সহিত তোমাদের সঙ্ঘের কোনও সম্পর্ক নাই। একটী অমার্জ্জিতরুচি পুরুষ বা নারীর পুত্র বা কন্যার যদি হইয়া থাকে চরিত্রস্খলন বা স্বামিগৃহে লাঞ্ছনা, তবে তাহা নিয়া স্থানে স্থানে আলোচনা করিয়া বাতাস কলুষিত করিয়া কি লাভ? কিন্তু ইহারা তাহাই করিবে আর গর্ব্বভরে বলিবে, কার ঘরে ছেলেমেয়েরা পতন-পথের পথিক হয় নাই যে, নিজের ছেলেমেয়ের জন্য আবার লজ্জা করিতে হইবে? আরও কত কিছু যে বলিবে, তাহার স্থিরতা কি?

এই জাতীয় অমার্জ্জিতরুচি অখণ্ডদিগের উপরে মণ্ডলীর প্রত্যেক ব্যক্তির শাসন-হস্ত উত্তোলন করা কর্ত্তব্য। মানুষের বাড়ীতে সমবেত উপাসনা হয় পরিবেশকে পবিত্র করিবার জন্য। ইহারা নূতন নূতন স্থানে পরিচয় স্থাপনের উপায় হিসাবে লোকের গৃহে যায় এবং নিজেদের পারিবারিক দুর্ঘটনাগুলিকে সালঙ্কারে বর্ণনা করিয়া লোকের কাছে বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করে। ইহারা বোঝে না, ইহাদের এই সকল আচরণ তোমাদের সঙ্ঘটীকে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে অত্যন্ত হেয় করিয়া দিতেছে।

এইবার লইয়া মোট দুইবার দেখিলাম যে, একটী অশিক্ষিতা রমণী সমবেত উপাসনা উপলক্ষ্যে দুই নূতন স্থানে মিলিত হইয়া প্রকাশ্য ভাবে তাহার স্বামীর সহিত তুমুল সংগ্রাম করিল এবং তাহা করিল উভয়ের জীবনের অতি নিকৃষ্ট ব্যাপারগুলি লইয়া। এমন অমার্জ্জিরুচি পুরুষ-রমণীকে তোমরা কোনও সমবেত উপাসনায় আসিয়া অশান্তি উৎপাদন করিতে দিও না। স্বামী ও স্ত্রীর লাঠালাঠি,

অভিযোগ-প্রত্যভিযোগ যার যার নিজ গৃহেই হউক। ভদ্রসমাজে এই সকল হীন ব্যবহার সমগ্র সঙ্ঘকে ছোট করিয়া দেয়। অনেক মূর্খ নরনারী এই সকল অমার্জ্জিত আচরণের অনুসরণ করিয়া নূতন অশান্তি সৃষ্টি করিতে প্রলুব্ধও যে হইতে পারে না, তাহা নহে।

এইবার আমি আর একটা ব্যাপার দেখিয়া হতবাক্ হইয়াছি। আমি জাতিভেদ মানি না, ইহা ত' প্রসিদ্ধ কথা। তথাপি কতকগুলি গুরুতর কারণে বর্ত্তমানে আমি আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের হাতের রান্নাই খাই। বিষদানে আমার প্রাণহানির চেষ্টা কি সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কয়েকবারই করে নাই? পাচকের অপরিচ্ছন্ন হস্তের অপরিচ্ছন্ন নখ হইতেই যে বারংবার আমাশয়ের দূষিত বীজাণু আহারকারীকে আক্রমণ করে, ইহাও কি তোমাদের সকলের জানা নাই? এবার দেখিলাম, আমার রান্নার হাঁড়িটার ভিতরে সকলেই গিয়া হাত ছোঁয়াইতেছে। অতীতে কাহারও কোনও কারণে এই বিষয়ে একবার অনুমতি লাভের সৌভাগ্য হইয়া থাকিলে সে নিজেকে আমার আহার সম্পর্কে একেবারে বিশেষজ্ঞ বানাইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে। ইহাদের এই আচরণের ফলে আমাকে যে আহার করিবার কালে অতিশয় সাবধান হইয়া যাইতে হইয়াছে, যাহার ফলে অতিশয় ভক্তিমান্ গৃহস্থের অজ্ঞাতে তাঁহার গৃহে হইয়া গিয়াছে আতিথেয়তার ত্রুটি, ইহা কি তোমাদের লক্ষ্যে পড়ে নাই? সারাজীবন যাহারা বাচালতা করিয়াই কাটাইল, তাহারা বিনা অনুমতিতে কেন আমার রান্নায় হস্তক্ষেপ করিতে গেল, এই প্রশ্নটা কি তোমাদের মনে জাগে নাই? জাতিভেদ মানি না, কিন্তু অন্য ত' দশটা নিয়ম মানি! সেই নিয়মগুলি সবই তোমরা পদবিদলিত করিতেছ। এভাবে কতকাল

তোমাদের উচ্ছৃঙ্খলতা চলিবে? আহারের অনিয়ম বৃদ্ধ উদরকে ক্ষমা করে না। অথচ আমাকে বৃদ্ধ শরীরে যুবকের মত শ্রম করিতে হয়।

আরও একটী কথা তোমাদের বলা দরকার বোধ করিতেছি যে, মণ্ডলীর কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে প্রেম এবং শাসন-ক্ষমতা এই দুইটাই সমভাবে থাকা আবশ্যক। তোমরা একদেশদর্শী হইয়া চলিও না। শাসকের রুদ্রমূর্ত্তিও নহে, প্রেমে বিগলিত কর্ত্তব্যবিমুখতাও নহে,— তোমাদের কাছে আমার প্রত্যাশা এই উভয়ের সমন্বয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৫ই আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

শীঘ্রই হয়ত আমি তোমাদের অঞ্চলে কয়েকটা স্থানে যাইব। তাহার সম্ভাবিত তালিকা দিয়া দিতেছি। তোমরা ঐ সকল স্থানের ভ্রাতাদের সহিত পত্রযোগে যোগাযোগ রাখিও। অফুরন্ত কাজের চাপে আমি তোমাদের অনেককে ব্যক্তিগত ভাবে পত্র দিতে সমর্থ হইব না। তোমরা যদি নিজ নিজ অঞ্চলের সকল স্থানের সকল ভ্রাতাদের সঙ্গে যাচিয়া সাধিয়া আলাপ-পরিচয় এবং যোগাযোগ নিয়তই রাখ, তাহা হইলে যে-কোনও সময়ে স্বল্পকালের খবর পাইলেও নিজেরা মিলিত হইতে পার। মিলনের যে আনন্দ, তাহা যদি আস্বাদ করিতে

চাহ, তাহা হইলে সদাসর্ব্বদা খোঁজ-খবর রাখিবার অভ্যাসটী বজায় রাখিতে হইবে।

অমুক গুরুভাই ধনী আর অমুক গুরুভাই দরিদ্র, এই সকল বিবেচনা করিয়া শ্রদ্ধা-প্রীতিতে কোনও তারতম্য না করিয়া সকলের সহিত পরিচয় রক্ষা করিয়া যাওয়া উচিত। যাহারা বড় চাকুরী করে বলিয়া গর্ব্বিত, যাহারা ধনী কিম্বা বিদ্বান বলিয়া অপরের কাছ হইতে নিজেদের দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে ব্যস্ত, এমন গুরুভাইদিগকেও তোমরা তোমাদের সহিত অপরিচিত থাকিতে দিও না। প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণের মধ্য দিয়া পরিচয়টা রক্ষা করিয়াই যাইও। আজ তাহারা অন্ধতা বশতঃ তোমার মত গরীবের সহিত পরিচয় রাখিতে অনিচ্ছুক হইতে পারে কিন্তু তোমার জীবনে যদি সাধন-ভজন চলিতে থাকে সুনিশ্চিত গতিতে, তাহা হইলে একদিন তোমার মত লোকের সঙ্গই তাহাদের পরমলোভনীয় হইবে। ধন, পদমর্য্যাদা বা বিদ্যার গরব মানুষের চিরকাল থাকে না, থাকিতে পারে না। কেহ অবস্থার ফেরে পড়িয়া, কেহ বা জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দর্প, দম্ভ, গর্ব্বের কবল হইতে রক্ষা পায়। মানুষ হিসাবে তখন তাহারা হয় সত্য সত্য দামী, তাই তাহারা ধনি-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকে দেয় সম্মান। তাই আপাততঃ অসুবিধাজনক হইলেও, যাহাদের সহিত আধ্যাত্মিক আত্মীয়তায় তুমি আত্মীয়, তাহাদের সহিত পরিচয় রক্ষার সকল সঙ্গত সুযোগ সর্ব্বদা সুযোগ্য ভাবে গ্রহণ করিবে।

কিন্তু একটী কথা মনে রাখিও যে, ইহাদের কাহারও কাছ হইতে তোমার নিজের কোনও পার্থিব স্বার্থের ক্ষীণতম প্রত্যাশাও রাখিও না। নিষ্কাম পরিচয় উভয়তঃই লাভজনক হইবে। স্বার্থসাধনের

জন্য ইহাদের সহিত পরিচয় করিতে গেলে তুমি ইহাদের দৃষ্টিতে এত ছোট হইয়া যাইবে যে, তোমারও স্বার্থ সাধিত হইবে না, ইহাদেরও কোনও মঙ্গল হইবে না।

আদালতে চাকুরী পাইবার প্রত্যাশায় জজ সাহেবের গুরুর নিকট দীক্ষা নেওয়া, বিনা ফিঃতে পরিজনবর্গের চিকিৎসা হইবে আশা করিয়া ডাক্তারের গুরুদেবের শিষ্য হওয়া, সিনেমা ও থিয়েটারের চান্স পাইবার আশায় ফিল্ম-ডিরেক্টারের গুরুদেবের নিকট মন্ত্র লওয়া প্রভৃতি অপকৌশল সেয়ান লোকেরা ধরিয়া ফেলিয়াছে। এই সকল ব্যাপার নিয়া অনেক গল্প-গাছাও সর্ব্বদাই শোনা যায়। যাহার সহিত তোমার পরিচয় হইতে যাইতেছে গুরুভাই বলিয়া, তাহার সহিত কোনও স্বার্থের সংশ্রব রাখা আদৌ সঙ্গত নহে। যে দেশে বা যে কালে গুরুদেবরাই শিষ্যদিগকে প্রতারিত করিয়া তাহাদের মনে দারুণ সংশয়, সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে কুণ্ঠিত নহেন, সেই দেশে বা সেই কালে এক গুরুভাই অন্য গুরুভাইয়ের সহিত স্বার্থের প্রয়োজনে পরিচয় রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে তাহাই বা কেন নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে না? গুরুভ্রাতাদের উৎপাতে অস্থির হইয়া অনেক গুরুগতপ্রাণ ব্যক্তিকেও দেখা গিয়াছে গুরুদেবের দ্বারা আয়োজিত উৎসবাদি বর্জ্জন করিয়া চলিতে। এই কথাগুলি তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

একজন গুরুভ্রাতা হয়ত কোনও উদ্বাস্তু-উপনিবেশের প্রধান পরিচালক। গুরুভ্রাতৃত্বের দাবীতে তাহার নিকটে কোনও অতিরিক্ত বা অন্যায় সুবিধা চাহিয়া বসিলে এমনও কি হইতে পারে না যে, তাহাতে তাহার অপক্ষপাত কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইবে? এমতাবস্থায় তাহার

নির্ম্মল যশে কলঙ্কপাত হইবার আয়োজন ভ্রাতা হইয়া তোমরা কেহ কেন করিবে? একজন গুরুভ্রাতা হয়ত মুন্সেফ বা জজ। তাঁহারই এজলাসে যে মামলা ঝুলিতেছে, সেই মামলা সম্পর্কে গুরুভ্রাতার দাবীতে তাহার নিকটে সুবিধা পাইবার জন্য তদ্বির করাও তদ্রূপ জানিও। একজন সাধারণ মানুষ অপর একজন সাধারণ মানুষের কাছে যে বিষয়ে যতটুকু সুযোগ সুবিধা প্রত্যাশা করিতে পারে, তুমি তোমার গুরুভ্রাতার নিকটে বৈষয়িক ব্যাপারে তাহার অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধার দাবী কখনও রাখিও না।

গুরুভাই একটা মহান্ পরিচয়। গুরুভাইকে দেখিলে গুরুভাই হইবে ঐশ্বরিক ভাবে অনুপ্রাণিত, এক গুরুভাই অপর গুরুভাইকে করিবে দিব্য প্রেরণায় সঞ্জীবিত, এক গুরুভাইয়ের চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম অপর গুরুভাইয়ের বর্দ্ধন করিয়া চলিবে নিষ্কাম জীবহিতৈষণা আর অফুরন্ত সাধন-স্পৃহা, ইহাই গুরুভাইয়ের সহিত গুরুভাইয়ের আদান-প্রদানের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। এই অবস্থাকে কোনও ক্ষুদ্র তুচ্ছ স্বার্থের খাতিরে নীচে টানিয়া আনা মূঢ়তা মাত্র।

গুরুকে দেখিলে শিষ্যের মনে যেমন ভগবৎ-সাধনের দিব্যানন্দ স্ফূর্ত্ত হইয়া ওঠা উচিত, গুরুর মানস-পুত্রে গুরু-সূক্ষ্ম ভাবে বিরাজিত বলিয়া গুরুভাইকে দেখিলেও গুরুভাইয়ের সেইরূপ হওয়া উচিত। আনন্দে গদ্‌গদ হইতে না পার, অন্ততঃ আনন্দের আবেশটুকু হওয়া উচিত। সম্বন্ধ তার প্রকৃত স্থানে পৌঁছিলে ইহাই স্বাভাবিক।

তোমা অপেক্ষা দুর্ব্বলতর গুরুভ্রাতাকে বল পরিবেশন করা, তোমা অপেক্ষা দরিদ্রতর গুরুভ্রাতাকে স্বাবলম্বী ও উপার্জ্জনক্ষম হইতে সাহায্য করা তোমার মত গরীবের পক্ষেও কল্যাণকর হইবে।

বিপন্ন মানুষ মাত্রকেই সাহায্য করা তোমাদের কর্ত্তব্য। সেই বিপন্ন মানুষটী যদি আবার গুরুভ্রাতা বা ভগিনী হয়, তাহা হইলে এ কার্য্য তোমার পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায় এইজন্য যে, তোমার গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের মধ্য হইতে দারিদ্র্য-দোষ উৎখাত হইলে পরোক্ষভাবে তোমার আধ্যাত্মিক সাধনার আবহাওয়াও উন্নত হইবে। দরিদ্রদের সমাজে পাপ বেশী, অপরাধ বেশী। ক্ষুধার তাড়নায় অনেক সৎলোকও অনিচ্ছায় অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। তাই সকল দরিদ্র ভ্রাতা-ভগ্নীদের অবস্থার উন্নতি সাধনে সহায়তা করিয়া তোমার ধর্ম্মসঙ্ঘকে নৈতিক দিক দিয়া সবল করা দরকার।

কোনও গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনীর নৈতিক অবনতি ঘটিলে তাহাকে জোর করিয়া পাপপঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিবার দায়িত্বও তোমাদের। গুরুভাই বা গুরুভগিনী বলিয়া আনন্দে ডগমগ হইয়া যাহার নিকটে গা-ঘেঁষিয়া বসিতেছ, তাহাকে প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন সর্ব্বপ্রকারের পাপ হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব তুমি কোন প্রকারেই এড়াইতে পার না। নিজ সহোদর ভ্রাতার কলঙ্ককে যেমন করিয়া দূর করিতে হয়, তোমার গুরুভ্রাতার কলঙ্ককেও তেমন করিয়া দূর করিতে হইবে। সে যদি চোর-জুয়াচোর হয়, তোমাদিগকে চেষ্টা করিয়া তাহার স্বভাব বদলাইতে হইবে। সে যদি লম্পট বা দুশ্চরিত্র হয়, তোমাদিগকেই চেষ্টা করিয়া তাহার অন্যায় আসক্তি দূর করিয়া দিতে হইবে। হিতবুদ্ধি দিয়া দিয়া তাহার পাপক্ষয় করিতে হইবে। তাহার অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া নহে, তাহাকে উত্তম আদর্শের প্রতি আগ্রহবান্ করিবার চেষ্টা করিয়া ইহা করিতে হইবে।

ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহা তোমার মানব-সমাজের প্রতি অতি স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। সঙ্কীর্ণতর দৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহা

তোমার সঙ্ঘের প্রতি এক আবশ্যিক কর্ত্তব্য। যে সঙ্ঘে দয়াল গুরুর অপার কৃপায় চোর, ডাকাত, লম্পট বা অসতীও দীক্ষামূলে আশ্রয় পাইতে বঞ্চিত হয় না, সেই সঙ্ঘে যদি ইহাদের চরিত্র-বিশোধনের সহায়তা করিবার জন্য চারিদিক হইতে চরিত্রবান সততাপরায়ণ ভ্রাতারা কর-প্রসারণ না করে, তবে আস্তে আস্তে এই ধর্ম্মসঙ্ঘ যে চোর ডাকাতে অসতের সঙ্ঘেই পরিণত হইয়া যাইবে। ইহার যে আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা কিছুই থাকিবে না! দয়াল গুরুরা চোরকে বা লম্পটকে ঘৃণা করেন না, ইহা তাঁহাদের মহত্ত্ব। কিন্তু চোর-ডাকাত যদি দীক্ষার পরেও চোর-ডাকাতই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ইহার চাইতে বড় বিপদ আর কি আছে? চোর, ডাকাত, মদ্যপ বা লম্পট বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিতে বলি না। প্রেমই করিতে হইবে। কিন্তু সেই প্রেম ইহাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তনে যেন সমর্থ হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৬ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আজ তোমরা অপরাপর সকল হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সাধক-সম্প্রদায়েরই ন্যায় হয়ত গুরু-পূর্ণিমা পালন

করিতেছ। আমি এই বিষয়ে তোমাদিগকে কোনও সুনির্দ্দিষ্ট প্রবর্ত্তনা না দিলেও ইহা পচ্ছন্দই করি যে, সেই দিনে স্মরণাতীত কাল হইতে সকল সাধকদলই নিজেদের গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া আধ্যাত্মিক উৎকর্ষমূলক উৎসবানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন, সেই দিনটীতে তোমরা বিশ্বের সকল গুরুর সম্মানার্থ জগৎকল্যানসঙ্কল্পে নিশ্চয় সমবেত উপাসনা করিতেছ। আমি তোমাদের গুরু, এই বলিয়া এই বিশেষ দিনটীতে আমি তোমাদের নিকট হইতে অন্য কোনও বিশেষ জিনিষ প্রার্থনা করি না। আমি তোমাদের নিকটে চাহি তোমাদের গাঢ়তর সাধনাভিনিবেশ, দৃঢ়তর সাধননিষ্ঠা। ইহার বলে তোমরা মহীয়ান্ হও এবং বিশ্বের সকল বৈষম্যের দুঃখ বিদূরিত কর। কেবল নিজের মোক্ষের জন্যই তোমরা আমার শিষ্য হও নাই, তোমরা আমার কাছে আসিয়াছিলে বিশ্বের কুশলে আত্মসমর্পণ করিতে। কেবল একজনের ত্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই তোমাদিগকে ব্রাহ্মণ্যের উচ্চতম অধিকার বিতরণ করি নাই, আমি চাহিয়াছিলাম তোমাদের এক এক জনের মধ্য দিয়া শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ অজ্ঞান মানবের ভ্রান্তিবিদূরণ, শ্রান্তিপ্রশমন, দুঃখ-বিমোচন।

এই দিনটীতে তোমরা সেই কথাটী বিশেষ করিয়া স্মরণ করিও।

আমি শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে আসিতেছি। সম্ভবতঃ তখন বর্ষাধারায় ধরণী পরিসিঞ্চিত হইবে, হয়ত তখন গ্রাম্য পথ-ঘাট যাতায়াতের পক্ষে অসুবিধাজনকও হইয়া উঠিতে পারে। তবু আসিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমার আগমন-সম্ভাবনার সংবাদ সামান্য প্রচারিত হওয়াতে চতুর্দ্দিকে যে আনন্দ-শিহরণ জাগিয়াছে, তাহা হইতে আমার যাওয়ার যুক্তিযুক্ততা সমর্থিত হইতেছে। কিন্তু মাত্র ঐটুকুতেই ত'

আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি না বাবা। আমি চাহি যে, আমার আগমনের আগে তোমরা নিজেদের সর্ব্বশক্তি দিয়া মানুষের মনকে অধিকার কর। অমৃতপানে যে দিব্য কান্তি ফোটে, সাধন-রস-পানে তাহা তোমাদের চখে-মুখে ফুটুক। তোমাদের চরিত্রের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম ও সৌন্দর্য্য দিয়া তোমরা দিকে দিকে মানুষের মনকে মুগ্ধ কর। উৎসবের বাহ্যাড়ম্বরে লোককে বিভ্রান্ত করিয়া অগ্নিশিখার পানে পতঙ্গের মত না টানিয়া, তোমাদের স্নিগ্ধ সুন্দর সাধনোজ্জ্বল জীবনের দেদীপ্যমান প্রভায় ইহাদের আকর্ষণ কর। ঘরে ঘরে যাইয়া তোমরা উচ্চাদর্শের প্রেরণা কর পরিবেশন, দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়াইয়া তোমরা দিব্য জীবনের আলেখ্য করিতে থাক প্রদর্শন। কথার দাপটে মানুষের বিচার-বুদ্ধি ঘোলাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নিরীহ মেষপালের মতন পরিচালনের জন্য নহে, প্রেমের অকপট অনাবিল অনবদ্য অমোঘতায় তাহাদের হৃদয়-মন পরিষিক্ত করিয়া, জ্ঞানের সুবিমল জ্যোতির্ম্ময় ভ্রান্তিহর আলোকে তাদের চিত্ত-বুদ্ধি-প্রাণ পরিমার্জ্জিত পরিশোধিত সুসংগঠিত করিয়া স্বাধীন এষণায় স্বাধীন ধীষণায় তাহাদিগকে কল্যাণের পথে টানিয়া আন। তাহাদের প্রতি তোমাদের কত যে করিবার রহিয়াছে, তাহা তোমরা আদৌ জান না। কাজে নামিয়া দেখ যে, কত করিবার ছিল কিন্তু এতকাল কেহ কর নাই, কত বলিবার ছিল কিন্তু এতকাল কেহ বল নাই, কত জানিবার ছিল কিন্তু এতকাল কেহ জান নাই।

ধারাবাহিক ভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া কাজ না চালাইতে পারিলে মানুষের মনে কোনও উচ্চ সংস্কারকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আকাশের মেঘের মত চঞ্চল মানুষের মন, তাহাতে কোনও নির্দ্দিষ্ট

সৎসংস্কার সহজে ধ্রুবস্থিতি পায় না। সংস্কারকে চিরস্থায়ী করিতে হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া সদ্ভাব-পরিবেশনের ব্রত নিতে হয়। সেই কাজে তোমরা হাত দাও।

ইহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, তোমাদের অঞ্চলের লোক এখনও নানা মতের নানা পথের কথা শ্রবণ করে নাই বলিয়া জীবনের কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মপালন সম্পর্কে ইহাদের কোনও বুদ্ধিসংমোহ জন্মে নাই। যাতায়াতের অসুবিধা, অর্থাগম-সম্ভাবনার অভাব আদি নানা কারণে ঐ স্থানগুলিতে জমি চষিতে প্রসিদ্ধ চাষাদের প্রচারকেরাও অধিক উদ্যম করেন নাই। তোমাদের পক্ষে সর্ব্বশক্তি লইয়া কাজ করিবার ইহাই উত্তম ক্ষেত্র। কোনও মত-পথের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে হইল না অথচ ঘুমন্ত মানবের জাগৃতি সম্পাদনে শ্রম স্বীকার করিয়া ধন্য হইলে, ইহা কম সুবিধার কথা নহে। অপরেরা যখন সুগম সুভিক্ষ স্থানগুলিতে দলে দলে যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের মধ্যে নানা দার্শনিক জটিলতাপূর্ণ কলহ-কচায়নে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া রহিয়াছেন, তোমরা সেই সময়ে এই দুর্গম ও নির্ধন অঞ্চলগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তামসিকতাবর্জ্জিত প্রতিবাদ-সম্ভাবনাহীন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতি জনে সমগ্র সামর্থ্য লইয়া কাজে নামো।

অদ্য এই গুরুপূর্ণিমার দিন তোমাদের আমি প্রতিশ্রুতি-বাক্য দিতেছি যে, তোমাদের যে দীক্ষা আমি দিয়াছি, তাহার প্রকৃত অর্থই এই যে, অতগুলি সৈনিক আমি সৃষ্টি করিয়াছি, অতগুলি প্রচারক আমি তৈরী করিয়াছি, অতগুলি সাধকের আমি জন্ম দিয়াছি। তোমরা প্রত্যেকে সাধক হও, সাধনার বলে প্রচারকের পূর্ণ যোগ্যতা আহরণ কর। নির্ব্বিদ্বেষ মন লইয়া প্রচার-কার্য্য করিয়া যাও এবং যেখানেই

যত বিরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখীন হও না কেন, পলায়নপর না হইয়া, সৈনিকের ন্যায় সকল অস্ত্রাঘাত বক্ষে ধারণ করিতে করিতে অগ্রসর হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

কলিকাতা
১৬ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে এবং মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্য এবং সদস্যাকে জানাইবে। এই পত্র যেদিন পাঠ করিবে, সেইদিনই তোমাদের জেলার প্রত্যেকটী মণ্ডলীর কর্ম্মকর্ত্তৃগণের দৃষ্টি এই পত্রে লিখিত বিষয়গুলির সম্পর্কে আকর্ষণ করিবে। যখনই তোমাদের যাহাকে যেই পত্রখানা লিখি, তাহা যে তোমাদের সংঘের সকল স্থানের সকলের প্রতি লেখা, এই বিশ্বাসটী কোনও কালেই তোমরা হারাইও না। যে পত্র বর্ত্তমান কালে বসিয়া লিখিতেছি, তাহা ভবিষ্য কালের কর্ম্মীদেরও জন্য, এই ধারণাও যেন তোমাদের সুস্পষ্ট রূপে থাকে।

প্রথমে মনে রাখিও যে, তোমাদের সংঘে নিম্নলিখিত অনাচারটী যেন কোনও কালেই অনুষ্ঠিত হইতে না পারে। যথা,—মনে কর, তোমাদের নিজেদের অর্থে বা জনসাধারণের অর্থে, এমন কি সরকারী অর্থেই কয়েকটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়া

তোমাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে বা তত্ত্বাবধানে আসিল। নিজ ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতি প্রাণের পূর্ণ আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও তোমরা যেন কখনও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় আচ্ছন্ন-দৃষ্টি হইয়া ভিন্ন ভাবে ধর্ম্মসাধনকারীদের পুত্রকন্যাকে তোমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে এবং ভিন্নভাবে ধর্ম্মসাধনকারী রোগীদিগকে তোমাদের চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান হইতে দূরে রাখিবার ষড়যন্ত্র করিও না। সম্প্রতি কয়েকটা ধর্ম্মসঙ্ঘ তোমার আমার দেওয়া অর্থে পরিস্ফীত হইয়া, তদুপরি সরকারী অর্থ-সাহায্য প্রচুর পরিমাণে পাইয়া, মদগর্ব্বে এই কথা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে যে, ইহারা অসাম্প্রদায়িকতার বুলি গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া শত কণ্ঠে কপচাইতেছিল বলিয়াই জনসাধারণের অর্থাৎ আমার ও তোমার অকুণ্ঠ অর্থসাহায্যের অধিকারী হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ মনে রাখিও যে, যেখানেই যাও, তোমাদের নিজেদের মত-পথ প্রচারের জন্য কোনও স্থানেই প্রলোভন-প্রদর্শন, চালাকী বা উৎপীড়নের চেষ্টা করিবে না। সম্প্রতি কোনও কোনও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানকে উল্লিখিত কার্য্যগুলির প্রত্যেকটী অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে। এক সময়ে এক শ্রেণীর অহিন্দু ধর্ম্মপ্রচারকেরা মেমের সহিত বিবাহ দিবার প্রলোভন দেখাইয়া হিন্দুসন্তানদিগকে নিজধর্ম্মাবলম্বী করিত। আর এক শ্রেণীর অহিন্দু ধর্ম্মপ্রচারকেরা কুলকন্যা বা কূলবধূকে অপহরণ করিয়া ধর্ষণের দ্বারা তাহার মনোবল ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বসমাজে পুনরায় স্থান পাইবার সমস্ত আশা নির্ম্মূল করিয়া দিবার পরে নিজধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া তাহাকে হাতে হাতে স্বর্গ পাওয়াইয়া দিত। এই জাতীয় ইতর চেষ্টা হিন্দুনামধারী দীক্ষাদাতাদের ভিতর এতকাল লক্ষ্য করা যায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে, বয়ঃস্থা কুমারী

কন্যা কেন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট নির্দ্দিষ্ট এক মতে দীক্ষা গ্রহণ করিল না, তাহার জন্য তাহার কটিবস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহার নিতম্বে প্রজ্বলন্ত রক্তবর্ণ চিমটার আঘাত পর্য্যন্ত করা হইতেছে। ধর্ম্মের নাম করিয়া লোক-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া যখন জনসমাজে সমর্থনকারীদের সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়া যায়, তখন এই সকল বেপরোয়া অন্যায় অনায়াসে চাপা পড়িয়া যায় এবং একটা অন্যায় সঙ্গে সঙ্গে শাসিত না হওয়ার দরুণ দশটা নূতন নূতন অন্যায় কেবল প্রশ্রয় পাইতেই থাকে। তখন হয়ত নরহত্যা ও নারী-ধর্ষণ এক এক বিচিত্র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা সমর্থিত হইতে থাকে। তোমাদের ধর্ম্মপ্রচার-প্রচেষ্টার মধ্যে পাপ, অসত্য ও অপরাধ যেন কোনও সময়েই বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় না পায়।

তৃতীয়তঃ মনে রাখিও যে, যুগের প্রয়োজনে এবং আমার অন্তরের সাম্যবোধ বশতঃ তোমাদের যাবতীয় ধর্ম্মমূলক অনুষ্ঠানে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে পুরুষ এবং নারীদের সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাগুলির তারিখ সপ্তাহে দুইটী বিভিন্ন বারে করা হইয়া থাকিলেও বিশেষ বিশেষ উপাসনায় নারী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেই একত্র হইয়া থাকেন। এইরূপ বিমিশ্র উপাসনাতে পুরুষ ও মহিলাদের বসিবার স্থান একটু আলাদা থাকিলেও অত্যন্ত ভিড়ের সময়ে পুরুষদের মধ্যেই কোনও নারী বা নারীদের মধ্যেই কোনও পুরুষ দৈবাৎ বসিয়া গেলে তাহা নিয়া কোনও উদ্বেগ ও অশান্তি তোমরা পোষণ কর না। কিন্তু তোমাদের সমবেত উপাসনা ত' কালে ভদ্রে অনুষ্ঠিত হইবার ব্যাপার নহে। ইহা অনুষ্ঠিত হইতেছে বৎসরে প্রায় পঞ্চাশ, ষাট বা আশি দিন। এই

আশি দিনই যদি পুরুষ ও মহিলারা একত্র সমবেত উপাসনা করিতে থাকেন, তাহা হইলে নিতান্ত অপরিচিত নারী-পুরুষের মধ্যেও পরিচয়, এমন কি ঘনিষ্ঠতা, সৃষ্টি হইতে পারে। বিশেষতঃ সমবেত উপাসনার পরে মন স্বভাবতঃই অতি সহজ সরল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে বলিয়া দুষ্ট লোকের কদুদ্দেশ্য সম্পর্কে মনের সতর্কতা-বোধ অনেকটা শিথিল হইয়া পড়ে। তদুপরি সমবেত উপাসনা দ্বারা উপাসক-মণ্ডলীর সকলের মধ্যে একটা দিব্য প্রীতির ভাব আপনা আপনি সৃষ্ট হয়। সুতরাং সমবেত উপাসনাকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত পাপমুক্ত রাখিবার জন্য তোমাদের কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক হইবে। এই কথাটি তোমরা কখনও ভুলিও না।

বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে কয়েকটা বিপথগামী সমাজ নারী ও পুরুষকে নিয়া জঘন্য যৌনাচার সমূহের অনুশীলন একদা করিয়াছে। লিঙ্গপূজা এবং যোনিপূজা উপলক্ষ্য করিয়া তান্ত্রিক সমাজের কতকাংশেও অনেক প্রকার অসামাজিক ব্যবহার একদা সুপ্রচুর হইয়াছে। শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবেরা প্রথমোক্ত আচার সমূহকে কদাচার ও শাস্ত্রাভিপ্রায়-বিরোধী বলিয়া প্রতিবাদও করিয়াছেন। দ্বিতীয়োক্ত আচার সমূহকে গার্হস্থ্যাবলম্বী তান্ত্রিক সাধকেরা কৃচ্ছ্রসাধন বলিয়া অপছন্দ করিলেও বা পঞ্চ-মকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বিষয়টার পূতিগন্ধ দূর করিতে চাহিলেও একদল তান্ত্রিক যেই অকথনীয় উদ্দামতার অনুশীলন একদা করিয়াছিলেন এবং যাহার স্মৃতিকথা বিভিন্ন তান্ত্রিক রচনাবলীর মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন, একদল অষ্টসিদ্ধিকামী ও সকাম সাধক ব্যতীত অপরে তাহা অগর্হিত বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি তাহাদের ভগ্নাবশেষ নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া নানা

সম্প্রদায়ে অতি গোপন ভাবে বাহুবিস্তার করিয়া চলিয়াছে। কিছুকাল পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ যোগসাধনা শিক্ষা-দানান্তে গুরুদেববিশেষের লোক-প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক অবস্থা খুব ঊর্দ্ধগতি পাইবার পরে হয়ত কাম-কদাচারকে তিনি তিব্বতী যোগ বা কাশ্মিরী যোগ বা কামরূপীয় সাধনা নাম দিয়া শিষ্য-শিষ্যা-বিশেষের মধ্যে প্রচলন সুরু করিলেন। এইরূপ ব্যাপার লইয়া সম্প্রতি কিছুকালের মধ্যে দেশের ধর্ম্মাধিকরণে বেশ কয়েকটা মামলা-মোকদ্দমাও হইয়া গিয়াছে। তোমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, তোমাদের সংঘটীর মধ্যে এমন জিনিষ যেন কোনও ছল-ছুতা আশ্রয় করিয়াই প্রবেশ করিতে না পারে, যাহার পরিণাম হইবে যৌন কদাচার ও অসামাজিক ইন্দ্রিয়-সেবাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া সমাজে তুলিবার চেষ্টা।

এই কয়টী বিষয়ে যদি বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে সর্ব্বসময়ের জন্যই সতর্ক থাকিতে না পার, তাহা হইলে একদা তোমাদের সঙ্ঘ আর কয়টা গো-ভাগাড়েরই ন্যায় শেয়াল-শকুনির প্রিয় লক্ষ্যস্থল হইবে।

যে যুগে থিয়েটার, সিনেমা দেখিতে, স্বদেশী বক্তৃতা শুনিতে, সঙ্গীতের জলসায় নারীর পাশে পুরুষ এবং পুরুষের পাশে নারী অবাধে বসিতেছে, যে যুগে বাসে ট্রামে নারী-পুরুষ ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি করিয়া আসন সংগ্রহ করিতেছে, যে যুগে একই অফিসের একই টেবিলে বসিয়া একদল নারী আর পুরুষ কেরাণী কুণ্ঠাহীন মনে কলম পিশিতেছে, যে যুগে মাছ, তরকারী, ফল বা কাপড়ের দোকানে নারী ও পুরুষ ভিড়ের ভিতরেও বাজার-সওদা করিতেছে, সে যুগে পুরুষদের ও নারীদের জন্য আলাদা করিয়া সমবেত

উপাসনার আয়োজন করিতে যাওয়ার চেষ্টা একটা অর্থহীন বাতুলতা। কিন্তু নারী ও পুরুষের এই অবিরাম মিশ্রণ যাহাতে ধর্ম্মবিরোধী, নীতিবিরোধী বা সমাজবিরোধী কোনও জৈবিক অন্যায়ের না হয় প্রশ্রয়দাতা, তার দিকে তোমাদের প্রতি জনের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে যুগে মাতা উপার্জ্জন করিয়া অক্ষম পুত্রকে লেখাপড়া শিখায়, পত্নী উপার্জ্জন করিয়া রুগ্ন স্বামীর চিকিৎসা চালায়, কন্যা উপার্জ্জন করিয়া বৃদ্ধ পিতার গ্রাসাচ্ছাদন-ব্যবস্থা করে, সে যুগে ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে নারীদিগকে পুরুষদের কাছ হইতে পৃথক্ করিয়া দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু সর্ব্বব্যাপারেই সতর্কতার প্রয়োজন আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৬ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পার্ব্বত্য অঞ্চলে তোমরা তোমাদের কাজ একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পার না। লক্ষ্য করিয়া দেখ, অতীতে যে যে স্থানে তোমরা যে কাজটুকু করিয়াছ, তাহা যদি আরও একটু ব্যাপকভাবে করা হইত, তাহা হইলে প্রাণের আশঙ্কায় এখন যেই সকল স্থানে যাইতে সাহসী হইতেছ না, সেই সকল স্থানে তোমাদের কত বান্ধব সৃষ্ট হইয়া

থাকিত। ভারত-সরকার নাগা-সমস্যাকে উপযুক্ত সমাধান দিতে পারিতেছেন না বলিয়া আস্তে আস্তে তেমন পার্ব্বত্য জাতিগুলির ভিতরেও ভাবান্তরের সৃষ্টি হইতেছে, যাহাদের শান্তিপ্রিয়তা সম্পর্কে ইহার পূর্ব্বে কাহারও মনে কণামাত্র সংশয় ছিল না। এই জন্যই আমি মনে করিতেছি যে, যে সকল পাহাড়ী অধিবাসীর মধ্যে এখনও শান্তিপ্রিয়তা বিরাজ করিতেছে বলিয়া তোমরা বিশ্বাস কর, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের অভিযান নিয়া দ্রুত অগ্রসর হইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যতটুকু সময় তোমরা হারাইবে, এমন বিচিত্র নহে যে, ততগুলি লোক তোমরা হারাইতে পার। তোমাদের সহিত ধর্ম্মের, সংস্কারের, আদর্শের বা অনুশীলনের কোনও সাম্য নাই বলিয়াই ইহারা এতকাল দূরে দূরে সরিয়া পরের মত রহিতে পারিয়াছে। তোমরা যতই নিত্য নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিয়া পাহাড়ের ভিতরে গিয়াছ, ইহারা ততই নিজ নিজ বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া আরও দূর-দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছে। তোমরা যাহাকে সভ্যতা বল, তাহার ছোঁয়াচ ইহারা সহ্য করিতে পারে নাই। ইহারা কেবলই সন্দেহ করিয়াছে যে, কি জানি, তোমাদের সংস্পর্শে আসিলে যদি ইহারা একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়! সেই সন্দেহ ইহাদের এখনও ঘোচে নাই। কিন্তু এখন জগতের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তোমাদের আর্য্যামি সেই সময়ে ইহাদিগকে করিত অবজ্ঞা, তোমাদের আর্য্যত্বের অভিমান এখন চাহিতেছে ইহাদিগকে আপন করিতে। জগতের নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও মনোভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাই আজ ইহাদিগকে আপন বলিয়া কাছে টানিয়া আনার গুরুত্ব বাড়িয়াছে। পরকে আপন করার নামই যে হিন্দুধর্ম্ম, আপনকে পর

করিয়া দূর করিয়া সহস্র যোজন দূরে সরাইয়া দেওয়া যে হিন্দুধর্ম্ম নহে, ইহা তোমরা এখন বুঝিতে পারিতেছ। তাই ত' তোমাদের বারংবার ডাকিয়া বলিতেছি, ছুটিয়া যাৰ বনে, পার্ব্বতে, প্রান্তরে, কান্তারে, গিরিগুহায়, উপত্যকায়, গিরিশৃঙ্গে, অধিত্যকায়।

প্রথমে ছোট ছোট দলে যাইবে। পাঁচ ছয় জন বুদ্ধিমান্, কর্ম্মঠ এবং কার্য্যকালজ্ঞ ব্যক্তিই যথেষ্ট। অপরিচিতের সহিত সরল সহজ প্রেম লইয়া পরিচয় করিবে। নিজের বোঝা নিজের ঘাড়ে লইয়া যাইবে, অপরের স্কন্ধে চাপিয়া তোমরা যাইও না। নিজেদের ব্যয় নিজেরা বহন করিবে, ইহাদিগকে তাহার ভার বহন করিতে বাধ্য করিবে না। ইহাদের ভালগুলির আগে খোঁজ করিবে, তারপরে ইহাদের মনের সহিত মিল রাখিয়া তোমাদের ভালগুলি বলিবে।

লখিমপুর, তেজপুর, যোড়হাট, ডিমাপুর, কোহিমা, ডিফু, ইম্ফল, নগাঁও, লঙ্কা, হোজাই, মাইবং, হাফলং আদি করিয়া সবগুলির চারি পার্শ্বেই একদা আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যেরা কিছু কিছু প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। মনিপুর রাজ্যে তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্মের দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন এবং আচার্য্যদের ধামের সহিত পুরুষানুক্রমিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না হওয়ার দরুণ আজও মণিপুর রাজ্যের অধিকাংশ নরনারী নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন। ক্ষাত্রজনোচিত পৌরুষ ইহাদের লোপ পাইয়াছে কিন্তু বৈষ্ণবজনোচিত ভক্তি ইহাদের অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। মন্দের মধ্য দিয়া এই ভালটুকু ইঁহারা আহরণ করিয়াছেন। অন্যান্য স্থানে কত আচার্য্য হস্তি-পদতলে, ব্যাঘ্র-নখরে, সর্প-কবলে প্রাণ দিয়াছেন, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু একদা ত্রিপুরা হইতে লিড়ু পর্য্যন্ত সকল স্থানেই সনাতন-ধর্ম্মী আচার্য্যেরা ধর্ম্মপ্রচারের মানসে

গিয়াছিলেন। আবার ব্রহ্ম হইতেও বৌদ্ধ শ্রমণেরা নগাঁও পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিলেন। উভয় দল অভিযাত্রীরই কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। সে কাজ তোমরা ইচ্ছা করিলেই সম্পূর্ণ করিতে পার।

যে কয়জন অভিযান লইয়া যাইবে, তাহাদের প্রতিজনেরই সর্ব্বপ্রথমে মনে জ্ঞানে ভগবদ্বিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য তোমাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান নহে, নৃতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন নহে, বাণিজ্য-বিস্তার নহে, সাম্রাজ্য-স্থাপন নহে। তোমাদের লক্ষ্য ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সৎশিক্ষার বিস্তার। এই জন্য তোমাদের সর্ব্বপ্রথমে হইতে হইবে ভগবদ্‌বিশ্বাসী। অবিশ্বাসী, নাস্তিক, কুতর্ক-প্রয়াসী, বিতণ্ডাকারী কেহ যেন অভিযাত্রী দলে স্থান না পায়। অভিযান-কারীদের বাক্‌সংযম, ইন্দ্রিয়সংযম, চরিত্রবল, আর্থিক ব্যাপারে সততা এবং পারস্পরিক ঐক্য যেন স্বতঃসিদ্ধ হয়। ইহার অভাব হইলে তোমাদের জয়যাত্রা পণ্ড হইবে।

বদরপুরের একটী ধর্ম্মাভিযাত্রী দল কোনও অনুন্নত সমাজের মধ্যে কাজ করিবার জন্য রওনা হইয়াছিল। পথমধ্যে তাহাদের দুই জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে অতি সামান্য ব্যাপার লইয়া এমন উত্তেজক উষ্ণতার সৃজন হইল যে, কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া ইহারা অনেক শ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে মানুষগুলির মনে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া আসিল এক বদ্ধমূল অনাস্থার। কথায় বলে "সুখের চাইতে স্বস্তি ভাল।" এই ক্ষেত্রে অভিযাত্রী দলের কোনও অভিযান নিয়া অগ্রসর না হওয়াই উচিত ছিল। হরিনাম-কীর্ত্তন, সমবেত উপাসনা, ধর্ম্মব্যাখ্যান এবং পাথেয় ব্যয় সব কিছুই মিথ্যা করিয়া দিয়া ইহারা অর্জ্জন করিয়া আনিল শুধু অবিশ্বাস আর কলঙ্ক।

যখনি যেখানে অভিযান চালাইবে, জেলার অখণ্ড-মণ্ডলীগুলির সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের দ্বারা পূর্ণ যোগাযোগ রাখিবে। প্রথম

দুই তিনটী অভিযানে সকলগুলি মণ্ডলীর সক্রিয় সহযোগ প্রয়োজন না হইলেও ক্রমশঃ কাজ অগ্রগতির দিকে যাইতে থাকিলে মাঝে মাঝে এক এক স্থানে সকল মণ্ডলীর সর্ব্বশক্তি প্রয়োগের দ্বারা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটাইবার আবশ্যকতা অবশ্যই পড়িবে।

তোমাদের জেলাগুলির সীমান্তে সীমান্তে যেমন তোমাদের অনেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে, জেলার অভ্যন্তরে নানা দুর্গম বন-জঙ্গলে তেমন ক্ষুদ্রতর অনেক কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়া গিয়াছে। জঙ্গল ভাবিয়া যেখানে সাপ-বাঘের ভয়ে কোনও দিন যাও নাই, এমন সকল স্থানে প্রবেশ করিলে হঠাৎ অবাক্ হইয়া দেখিতে পাইবে যে, গাছের ডালে টং বাঁধিয়া অনেক নরনারী এখনও সেই আদিম কালের সরলতায় বাস করিতেছে। তাহা ছাড়া দুর্গম অঞ্চলগুলিতে এমন অনেক অনুন্নত জাতি রহিয়াছে, যাহাদের তোমরা হিন্দু বলিয়া মনে কর কিন্তু তাহাদের মধ্যে তোমাদের চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ সংস্পর্শ প্রসারিত করিতে পার নাই।

এই সকল জাতির প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা বিস্মৃত হইতে পার না।

পার্ব্বত্য জাতিগুলির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের ব্যাপারে আর একটা উদ্বেগজনক সংবাদ এই যে, ইহারা প্রায় সকলেই দুই তিন চারি বৎসর পরে স্থিতিস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অনেক দূরে চলিয়া যায়। এই কারণে একই অঞ্চলে বৎসর বৎসর অভিযান চালাইতে না পারিলে হঠাৎ দশ বৎসর পরে গিয়া হাজির হইলে হয়ত দেখা যাইবে যে, পরিচিত লোকেরা কেহই সেখানে নাই, তাহাদের অপেক্ষা ভিন্নতর মনোবৃত্তির অন্য একদল লোক আসিয়া সেখানে বাস করিতেছে।

প্রায়-যাযাবর অনুন্নত এই মানব-গোষ্ঠী এই জন্যেই নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
১৭ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কোনও একটা কাজের ভার পাইলে কি কাজের ভার পাইলে, কতটুকু তোমার দায়িত্ব, এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য কি কি তোমাকে করিতে হইবে, সব কিছু একবারেই বুঝিয়া নিবার চেষ্টা করিও। একই কাজে তিনবার করিয়া উপদেশ আর সাতবার করিয়া তাগাদা দিতে হইলে তত্ত্বাবধায়কের প্রাণান্ত। কাজ ত' করিতে যাইতেছ সমাজ-কল্যাণের জন্য। একমাত্র আত্মপ্রসাদ লাভ করা ব্যতীত ইহাতে তোমার বা আমার ব্যক্তিগত কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই। সেই অবস্থায় কাজকে সরল সহজ গতিতে চলিতে দিবার জন্যও কাজের ভার নিবার সময়েই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া নেওয়া দরকার যে, কি করিতে যাইতেছ, কতটুকু তোমাকে করিতে হইবে, তোমার অবহেলা ঘটিলে তাহার ফল কোথা তক্ পৌঁছিবে।

অনেক বাগাড়ম্বর করিয়া যে সব কাজ হাতে নিয়াছ, তাহার প্রায় প্রত্যেকটাতেই শোচনীয় ব্যর্থতা আহরণ করিয়াছ। ইহার পরেও

কি তোমাদের ভাবিবার সময় আসে নাই যে, নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে কুইক মার্চ্চ করিয়া যাওয়া যায় কোন্ উপায়ে? দেখিতে দেখিতেই মানুষ কত কিছু শিখে। তোমরা কি ঠেকিয়া ঠেকিয়া ঠকিয়াও কিছু শিখিবে না? অনেক দিন ধরিয়া ত' বাবা অনেক কিছু কাজ করিতেছ। এখন একটু আধটু শিখিতে চেষ্টা কর। বেগার শোধের হিসাবে কাজে নামিলে কাজও হইবে না, শিক্ষাও হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
১৭ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি কিন্তু কোনও কোনও অংশ পাঠ করিয়া মনে হইল, তোমরা যেন সকলের প্রতি সকলে সহিষ্ণু নহ। কোনও মহৎ প্রতিষ্ঠান চালাইতে হইলে সহকর্ম্মীদের সহিত সহকর্ম্মীদের প্রাণ-ঢালা প্রেম ও অদোষদর্শী সহযোগ থাকা প্রয়োজন। ইহার অভাব হইলেই দলাদলি আসিয়া যায়। তোমরা সর্ব্বপ্রকার দলাদলি এড়াইয়া চল। একটা কাজেরই দশটা অংশ দশ জনে হাতে নিল, দশ জনেই পরস্পরের সহিত সহযোগ করিয়া কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা করিল,—ইহারই নাম একতা। সবাই মিলিয়া একটা জায়গাই ভিড় করিল, কাজ কেহই করিতে পারিল না পরন্তু হৈ-চৈই সার

হইল, ইহাকে একতা বলে না। কে কোন্ কাজটুকু করিবে, তাহা আগেই নির্দ্ধারিত হইয়া গেল এবং প্রতি জনে নিজ নিজ কাজ পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে সুসম্পন্ন করিল, কেহই সব কাজটুকু করিল না, প্রত্যেকেই কতক কতক করিয়া নির্দ্দিষ্ট অংশগুলি সম্পাদন করিল কিন্তু বহু-অংশে সমন্বিত একটী বিরাট বাষ্পীয় শকটের ন্যায় সমগ্র কাজটুকু ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইয়া যাইতে লাগিল,—ইহারই নাম সংগঠন। ঐক্য ও সংগঠন এই দুইটীকে বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারিলেই কাজ হইবে, কাজ হইবার অন্য উপায় নাই। কিন্তু প্রতি জন যদি প্রতিজনকে প্রেম না কর, তাহা হইলে ঐক্যও আসিবে না, সংগঠনও সম্ভব হইবে না।

ব্যক্তিগত প্রাধান্য স্থাপনের দুঃস্বপ্নগুলি দেখা হইতে তোমরা বিরত হও। প্রতি জনে প্রেমের পূজারী হও, ইহাই শান্তি ও সাফল্যের পথ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৭ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রীমান্ ন—' র দীর্ঘকাল হয় পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছে এবং এখন সে পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে বলিয়া লিখিয়াছ। এই বিষয়ে আমার অনুমতিও চাহিয়াছ। আমার ত' মনে হয় যে, বিবাহ একটা

নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। নিজের প্রয়োজন বুঝিয়া বিবাহ করা বা অকৃতদার থাকা উচিত। এই ব্যাপারে আমার আদেশ বা অনুমতির কোনও অপেক্ষা নাই।

বিবাহ একটা সামাজিক ব্যাপারও। সুতরাং বিবাহ-ব্যাপারে সমাজের সম্ভ্রান্ত অংশের সম্মতি ও অনুমোদন থাকা ভাল। বিবাহের মত ব্যাপার নিয়া কলহ-কোন্দল, দলাদলি, মামালা-মোকদ্দমা আদি না হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বিবাহে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের সম্মতি প্রয়োজন আর প্রয়োজন উভয়ের অভিভাবকদের সম্মতি। অবশ্য প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তিন আইনে রেজেষ্টারী করা বিবাহ অভিভাবকদের তোয়াক্কা না রাখিয়াই অধিকাংশ স্থানে হইতেছে কিন্তু অখণ্ডমতে বিবাহ যেন অভিভাবকদের সম্মতি ছাড়া না হয়, ইহা আমি অনেক কাল আগেই বলিয়া রাখিয়াছি।

বিপত্নীক কেহ পুনরায় বিবাহ করিবার কালে যেন স্মরণে রাখে যে, পরলোকগতা পত্নীর গর্ভে তাহার কোনও সন্তান থাকিয়া থাকিলে তাহার যত্ন, আদর, শিক্ষা ও উন্নতির সহায়ক রূপেই বিবাহ করিতে পাইবে। বিবাহ দ্বারা শিশুদের জীবনের কোনও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিলে চলিবে না।

পত্নীর প্রতি প্রেম বর্ত্তমানে একটা কথায় কথায় পরিণত হইয়াছে। যেই স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী শোকাকুল হইয়া শ্মশানাগ্নিতেই আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করে, সেই স্বামীই আবার শ্রাদ্ধের তারিখটী পার হইতে না হইতে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করে। প্রেম কথাটা অত্যন্ত খেলো ভাবে গ্রহণ করার দরুণই ইহা সম্ভব হইতেছে। বিবাহ জীবনের একটা মহান্ সংস্কার, মৃতদার ব্যক্তির পক্ষে এই সংস্কারের

Created by Mukherjee TK, DHANBAD

সম্মান রক্ষার চেষ্টা করা প্রশংসনীয়। পত্নীরা বিধবা হইলে আমৃত্যু নিষ্ঠায় ব্রহ্মচর্য্য-পালনের উপদেশ পায়। পতিরা বিপত্নীক হইলে কেন সেই উপদেশ পাইবে না? জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়ে দেশের অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা আতঙ্কিত হইয়াছেন। বিপত্নীকেরা কর্ম্ম-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেশের, দশের, জগতের সেবায় নামিলে কি কাজের মত কাজ হইত না? চাকুরী, বাকুরী, ঘরগৃহস্থী করিয়াও সন্ন্যাসীর মত জনসেবা করা যায়। বউ মরিয়াছে বলিয়াই গেরুয়া পরিয়া মঠের সাধু হইয়া অপরের অর্জ্জিত অন্নে তনুরক্ষা করিতে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই।

লক্ষ্য করিয়া কি দেখিতেছ যে, লোকের চিন্তাশীলতা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে? অধিকাংশেই গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অনেকে যাহা করে, সকলে তাহাই করিতেছে। নিজেদের আচরণে বা উদ্দেশ্যে কোনও বিশিষ্টতা কাহারও ফুটিয়া উঠিতেছে না। এই জন্যই একথা শুনিতে পাই, "কি করি, শিশুগুলিকে ত' পালন করিতে হইবে, তাই আবার বিবাহ করিলাম।"

কাহারও পুনর্ব্বিবাহের আমি বিরোধী নহি। বিবাহের এমন একটা দিক আছে, যেই দিকের প্রয়োজন মিটাইবার তাগিদ দেহে ও মনে প্রবল ভাবে থাকিলে জোর করিয়া অবিবাহিত থাকাই অন্যায়। কারণ, তাহাতে সমাজে গুপ্ত কদাচার বাড়িতে পারে। সমাজকে শুদ্ধ রাখিবার জন্যই বিবাহ-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। সমাজের মানুষগুলি শুদ্ধ থাকিলেই সমাজ শুদ্ধ থাকিল। "বিবাহ করিব না" এই জিদও ভাল নয়, "বিবাহ করিবই" এই জিদও ভাল নয়। যেই ব্যক্তি বিবাহ না করিলে সমাজের বেশী কুশল, সে কেন বৃথা বিবাহের পথে পা

বাড়াইবে? বিবাহ না করিলে যে সহজেই মায়ার কুহকে পড়িয়া যাইবে, সেই বা কেন বিবাহ করিয়া নিজের খুঁটির জোর বাড়াইবে না? ব্যাপারটা সম্পূর্ণই নির্ভর করে মানুষটার মনের বলের উপর।

তোমার পত্রে আরও একটী বিষয় লিখিয়াছ। শ্রীবাণী শাখা মণ্ডলীর সমবেত উপাসনাগুলি যাহাতে নিয়মিত ভাবে করে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে পত্র দিতে বলিয়াছ। সমবেত উপাসনা যে সর্ব্বত্রই সপ্তাহে একদিন অবশ্যই করিতে হইবে, এই নির্দ্দেশ আমার দেওয়াই আছে। একই নির্দ্দেশ প্রতিদিন নূতন করিয়া করিয়া ঝালাইতে হইবে কেন? কোনও কথা একবার বলিলে কেন তোমরা তাহা মনে রাখিবে না? স্মরণাতীত কালে বেদমন্ত্র ধরিয়া রাখিবার জন্য স্মৃতিশক্তির চর্চ্চার প্রয়োজন হইয়াছিল। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল যে, ব্রহ্মচর্য্যপালন করিলে স্মৃতিশক্তি বাড়ে। বংশানুক্রমিক স্মৃতিশক্তির চর্চ্চার জন্য বংশানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্য-পালন প্রয়োজন হইয়াছিল। এই ভাবেই এক-জাতির সমাজে হঠাৎ ব্রাহ্মণ নামে একটা পৃথক্ জাতির সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। আমি দেখিতেছি, আমার উপদেশগুলি মনে রাখিবার সামর্থ্য-বৃদ্ধির জন্য তোমাদের প্রতিজনের বিশেষ যত্নপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য-পালন করা প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য্য-পালনে তোমরা অধিকতর অবহিত হও। নতুবা, বারংবার এক উপদেশ দিলেই তাহা তোমাদের মনে থাকিবে, ইহার নিশ্চয়তা কি?

বাস্তব পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই তোমাদের সকল তপস্যার মেরুদণ্ড, এই কথাটী তোমরা ভুলিও না। ব্রহ্মচর্য্যে হেলা করিয়াই ত' তোমরা কর্ম্মে অবসাদ, কর্ত্তব্যে অবহেলা আর প্রতিটি ব্রতে ভ্রষ্টতা কুড়াইতেছ।

Created by Mukherjee TK, DHANBAD

ব্রহ্মচর্য্যকে শক্ত করিয়া ধর। বিবাহিত, অবিবাহিত সকল অবস্থায়ই ব্রহ্মচর্য্য-পালন করা যায়। বিবাহিতে আর অবিবাহিতে ব্রহ্মচর্য্যের একটু সামান্য প্রকারভেদ থাকিলেও ইহা নিশ্চিত জানিও যে, একদিনের ব্রহ্মচর্য্যও কিছু বল, কিছু মেধা, কিছু স্মৃতি, কিছু তেজ দান করে। ব্রহ্মচর্য্য কখনও ব্যর্থ হয় না। যে যতটুকু ব্রহ্মচারী, সে ততটুকু ধৃতিশীল। ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের মূলদেশে স্থাপন কর। তাহা হইলেই দেখিবে, তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনুরাগ বিনা প্রচেষ্টায় বাড়িয়া চলিতেছে। এমন প্রত্যক্ষফলদাতা কল্পবৃক্ষ হাতের কাছে থাকিতে তোমরা জীবনের উন্নতির জন্য অন্য কোন্ বস্তুর শরণাপন্ন হইবে?

অধিকাংশ মণ্ডলীগুলি যে বিশেষ বিশেষ সমবেত উপাসনার তারিখগুলি জানে না, ইহা আমার কাছে আশ্চর্য্য মনে হয়। এই তালিকা মুদ্রিত হইয়া বিতরণের সুব্যবস্থা করা আছে। এক মণ্ডলীতে কোনও কারণে সেই তালিকা না পৌঁছিয়া থাকিলে নিকটবর্ত্তী অন্য মণ্ডলী হইতে এই তালিকা নকল করিয়া নেওয়া যায়। একটু সামান্য পরিশ্রমকে ভয় করিয়া চলিবার মধ্যে কি কৃতিত্ব আছে বুঝা কঠিন। কেন তোমরা চতুর্দ্দিকের সকল মণ্ডলীকে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জোর করিয়া জানিতে বাধ্য কর না? অপরের অজ্ঞানতা দূর করিবার মধ্যে যেমন পুণ্য আছে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এই কর্ত্তব্যটী পালন সম্পর্কে আলস্য করিলে তাহারও পাপ আছে। তোমরা কাহাকেও অজ্ঞান থাকিতে দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৭ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এতদিন ধরিয়া তোমার নূতন বাসভবনে আসিয়াছ। এই নয় দশ বৎসরেও কি তোমার পল্লীর লোকের মধ্যে কোনও নূতন আধ্যাত্মিক প্রেরণা সঞ্চার করিতে পার নাই? তোমরা যত পাঠ, কীর্ত্তন ও উপাসনা করিয়াছ, তাহাতে কি কিছু লোকেরও প্রাণে নূতন ভাব, নূতন অভীপ্সা জাগে নাই? উত্তর যদি হয় নেতিবাচক, বুঝিব, তোমাদের পাঠ, কীর্ত্তন ও সমবেত উপাসনা সবই আন্তরিকতা-বর্জ্জিত ছিল।

এখনই তোমাদের গ্রামে মস্ত বড় একটা উৎসব না লাগাইয়া নিকটবর্ত্তী যে স্থানে আমি কিছুদিন মধ্যে আসিতেছি, সেখানে তোমাদের অঞ্চলের ভক্তিমান লোকদের নিয়া আস। তাহারা স্বল্প সময়ের জন্যও আমাদের সঙ্গে কীর্ত্তন-উপাসনাদি করিয়া বা সম্ভবমত উপদেশাদি শুনিয়া গৃহে ফিরুক। ইহার ফলে তোমাদের গ্রামে যে নূতন ভাবসঞ্চাণার সম্ভাবনা, তাহার উপরে ভিত্তি করিয়া তোমাদের গ্রামের ভাবী করণীয় অনুষ্ঠান সমূহের কার্য্যতালিকা রচনা করিও।

এক লাফেই দশ কাঁদি না হইয়া আস্তে আস্তেই সব বড় কাজ হইয়া থাকে। তোমরা কর্ম্মের বিশালত্বেও বিশ্বাস করিও, তাহার ক্রমবিকাশেও বিশ্বাস করিও। ক্ষুদ্র কর্ম্মারম্ভই ক্রমশঃ বিশাল বিরাট বিপুল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে, অবশ্য যদি নিষ্ঠাপূর্ব্বক কেহ কাজ কেবলই চালাইয়া যায়।

সংসারের পঞ্চাশ রকমের দায়িত্ব পালনের জন্য যেমন সময় পাইতেছ, এজন্যও তেমন তোমাদের সময় করিয়া নিতে হইবে।

যে একটী মাত্র সতীর্থ তোমার গ্রামে আছে, তাহাকে নিয়া আজই পরামর্শে বসিয়া যাও যে, ভবিষ্যতের বৃহৎ কর্ম্মায়োজনের প্রয়োজনে এখনই অতি ছোট করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কি কাজ তোমরা সুরু করিতে পার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

কলিকাতা
১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের গ্রামে আমার যাওয়ার প্রগ্রাম শীঘ্রই হয়ত রচিত হইবে। কিন্তু এই ভরা বর্ষায় যাতায়াতের কতকগুলি গুরুতর অসুবিধার দরুণ সন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থানের কোনও প্রগ্রাম করা হইবে না। তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে ঐ অঞ্চলের আগ্রহবান লোকগুলিকে তোমাদের গ্রামে আনিয়া সম্মিলিত করান। সকলেই চাহে যে আমি তাহাদের নিজ নিজ গ্রামে ভ্রমণ করিয়া আসি। সময়ের অসঙ্কুলান ও আকাশের অবস্থা হেতু সকল সময়ে সকল স্থানের অনুরোধ রক্ষা করা যায় না। আর, প্রত্যেক স্থানেই আমাদের যাইবার পূর্ব্বে

অনেকগুলি প্রাসঙ্গিক কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া রাখা দরকার। এই বিষয়ে প্রায় সকলকেই একেবারে উদাসীন দেখা যায়।

কোনও গ্রামে যাইব, নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য নিয়া যাইব। সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনসাধারণের মনে কৌতূহল, আগ্রহ ও জ্ঞান সৃষ্টি করিয়া রাখিলে কত দিক দিয়া কত সুবিধা। তরুণ কৈশোর হইতে শুরু করিয়া এই একটা উদ্দেশ্যেই কত গান, কবিতা, পত্র এবং প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি। কত হাজার হাজার বক্তৃতাও দিয়াছি। সেই সকল রচনা ও বক্তৃতা এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে প্রচারিতও হইয়াছে। আজ সেই সকল রচনার অধিকাংশই নাই, কিন্তু সামান্য যাহা সজীব রহিয়াছে, তাহারও পরিমাণ খুব কম নহে। এইগুলির সহায়তায় তোমরা প্রতিস্থানেই যথেষ্ট কাজ আগাইয়া রাখিতে পার। হয়ত ঠিক যেই কথাটী আমি তোমাদের গ্রামে গিয়া বলিব, তাহাই আমার রচনাবলীর মাধ্যমে আগে হইতে লোককে শুনাইয়া রাখিলে। ইহাতে একই কথা দুইবার শোনার সুফলটুকু লাভ হইবে। আর, যে কথা আমি হয়ত এবার গিয়া বলিবার অবকাশ পাইব না, তাহাই যদি পুস্তকাদির ভিতর দিয়া সকলের গোচরীভূত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে আমাদের আদর্শের সর্ব্বব্যাপকতার দিকটায় জনসাধারণের দৃষ্টি পড়িবে। ইহা এক মস্ত বড় লাভ। এ লাভ সর্ব্বসাধারণের, কেবল তোমার বা আমার নহে।

কিন্তু এই কাজটীতে তোমরা আগাগোড়াই অবহেলা করিয়া আসিতেছ। সর্ব্বত্রই তোমরা আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছ। সময়ে সময়ে সেই আশ্চর্য্য প্রদীপ যে হঠাৎ জ্বলিয়া

উঠিতেছে না, তাহা নহে। কিন্তু তাহার উপরেই নির্ভর করিয়া তোমরা কেন অলস হইয়া বসিয়া থাকিবে? লটারীর টিকিটের ভরসা না করিয়া তোমাদের যে প্রতি রোমকূপে স্বেদবিন্দু দিয়া যোগ্য ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

অজ্ঞান মানব প্রকৃত প্রস্তাবে হিতাহিত-বোধ-বর্জ্জিত পশু। স্বল্প-জ্ঞান মানব ক্ষিপ্ত পশু। পূর্ণজ্ঞান মানুষই প্রকৃত মানুষ, কারণ পশুত্বকে সে সবলে শাসন করিতে পারে। তোমরা আমাকে অজ্ঞান মানব-কূলের মাঝে নিয়া না ফেলিয়া পূর্ণজ্ঞান মানুষ সমূহের সঙ্গসুখ ভোগ করিবার সুযোগ কেন দিবে না? নিজেদের তোমরা যতই সংসারী আর নারকী বলিয়া ভাব না কেন, তোমাদের ক্ষমতা আছে অনেক অজ্ঞানের তমসাচ্ছন্ন চোখে জ্ঞানের বিমল দীপ্তি ফুটাইয়া তোলার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমারই গুরুভাই তোমাকে লাঙ্গলের ঈষা দিয়া এমন মার মারিল যে চামড়া ছিঁড়িয়া মাংস বাহির হইয়া পড়িল, সমস্ত শরীর রক্তে লাল হইয়া গেল, তুমি অচৈতন্য হইয়া রাস্তার পাশে পড়িয়া

রহিলে,—এ'-সকল সংবাদ শুনিয়া ত' স্থির থাকা যায় না বাবা। কৃষিকার্য্য বড়ই নিষ্পাপ জীবিকা কিন্তু চাষা কথাটা একটা গালিতে পরিণত হইয়াছে। এই জাতীয় লোকদের চরিত্রে বিরক্ত হইয়াই লোকে চাষা কথাটা গালি স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে মুসলমানের নিন্দাসূচক অনেক সংবাদ এখানে আসিয়া থাকে কিন্তু এখন ত' দেখিতেছি, ঐ পুণ্যভূমির হিন্দুরাও অবনতির তলদেশে গিয়া নামিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, নিজেদেরই সমাজে লক্ষ লক্ষ কুলাঙ্গার না থাকিলে কি হিন্দুজাতি আজ বিনা দোষে ভিখারী ও বাস্তুহীনে পরিণত হইয়াছে? ভগবান কাহাকেও বিনাদোষে সাজা দেন না। জাতিগত ভাবেই হিন্দু এত অধম হইয়াছে যে, তাহার প্রতি স্বজন ও পর সকলেই সমান নির্ম্মম হইতে পারিতেছে।

কিন্তু তুমি আশ্রম-কর্ম্মী। আহত হইয়াও তুমি কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিও না। কর্ত্তব্যবোধে যেখানে অন্যায়ের প্রতিবাদ বা প্রতীকার আবশ্যক বোধ কর, সেখানেও দুর্ব্বিনয় ও প্রতিহিংসা বর্জ্জন করিও। নিজেকে তুমি কোনও অবস্থায়ই অমহৎ হইতে দিও না।

পূর্ব্ববঙ্গে আমি তোমাকে আশ্রমের জমি পাহারা দিতে পাঠাই নাই। পাঠাইয়াছি আশ্রমের আদর্শ পাহারা দিতে। নিত্য উপাসনা, নিয়মিত কীর্ত্তন, অখণ্ড-সংহিতা পাঠ প্রভৃতির দ্বারা চারিদিকের অশুদ্ধ বায়ু বিশোধন করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্যই তুমি সেখানে রহিয়াছ। আশ্রমের সব জমিগুলিও যদি প্রতিবেশী মুসলমানেরা বা তোমার হিন্দুগুরুভাইয়েরা কাড়িয়া নিয়া যায়, তবু তাহাতে কোনও ক্ষতি হইবে না। কিন্তু আশ্রমে যাহারা থাকিবে, তাহারা যদি আশ্রম-

Created by Mukherjee TK, DHANBAD

ধর্ম্ম পালন করিয়া ত্যাগ, সংযম, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সেবা, সদ্বুদ্ধি ও জনকল্যাণের রুচি পরিত্যাগ করে, তবেই সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

জীবন বিপন্ন করিয়াও তোমাকে আশ্রম পাহারাই দিতে হইবে, এমন নির্ম্মম উপদেশ আমি তোমাকে দিতে পারিব না। জীবন বিপন্ন করিয়া কেবল একটী কাজ করা যায়। তাহার নাম আদর্শ রক্ষা। লোকের অজস্র অসদ্ব্যবহারের বিনিময়ে তুমি সদ্ব্যবহারই দিও, নিন্দার বিনিময়ে প্রশংসাই দিও, ক্ষতির বিনিময়ে অপরের মঙ্গল-চিন্তাই করিও। অপরে অমানুষ হইয়াছে বলিয়াই তুমি মানুষের মত মানুষ হইবে না, অপরে পশুত্বের স্তর অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধগমনে অনিচ্ছুক বলিয়াই তুমি দেবতা হইতে চাহিবে না, ইহা হইতে পারে না। আশ্রমের জমির উপরে অবৈধ লালসা বশতঃ যাহারা অন্যায় করিতেছে, ক্ষোভদ্বেষহীন অনাসক্ত ব্যবহারের দ্বারা কখনও তাহাদের মনোগতি যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, তাহা নহে। কিন্তু যাহারা ভ্রম-প্রমাদ বশতঃ অসদ্ব্যবহার করিতেছে, তাহারা শীঘ্রই তাহাদের ভ্রম বুঝিবে। তুমি উদ্বিগ্ন না হইয়া তাহাদের ভ্রান্তিনিরসনের কাল-প্রতীক্ষা কর।

ইহারা অত্যাচার করিলেও তুমি ক্ষমাশীল থাকিও। ইহাদের অত্যাচারের মর্য্যাদা অপেক্ষা তোমার ক্ষমার মূল্য অনেক বেশী। ইহারা অত্যাচার করিয়া একদিন বা দুইদিন হয়ত কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির লোকের নিকট বাহবা পাইবে কিন্তু তুমি হাসিমুখে সব ক্ষমা করিয়া অনন্তকালের জন্য প্রশংসাভাক্ হইবে। তুমি তোমার অন্তরের প্রশান্তি হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হইও না।

তুমি আমার কাজ করিবার জন্যই ওখানে রহিয়াছ, আমার প্রত্যেক সন্তানের কর্ত্তব্য হইতেছে বিঘ্ন-বিপত্তিতে তোমার পিছনে আসিয়া দাঁড়ান। প্রতি জনের কর্ত্তব্য হইতেছে তোমাকে প্রতিটি সৎকার্য্যে সহায়তা করা। তাহার পরিবর্ত্তে যখন দেখিতেছি যে, তোমার গুরুভাই-নামধারী ব্যক্তির মনে লাঙ্গলের ঈষা দিয়া তোমাকে মারিতে দ্বিধা আসে না, তখন বুঝিতেছি, আমাকে অতি রুক্ষ একটী আদেশ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে যথাকালে সেই আদেশ সকলে শুনিবে। আপাততঃ আমি এই বিষয়ে নিঃশব্দ রহিলাম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চোখের উপরে সৎকার্য্য হইবে, তোমরা তাহাতে অংশ নিবে না। চোখের উপরে অন্যায় সংঘটিত হইবে, তোমরা তাহাতে প্রতিবাদ করিবে না। অসহায় আর্ত্ত ব্যক্তি সাহায্যের জন্য আর্ত্তনাদ করিবে, তোমরা তাহাতে কর্ণপাত করিবে না। পরম দয়াল দাতা তোমাদিগকে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিতরণের জন্য আকুল হইয়া আহ্বান করিবেন, তোমরা থালি ভরিয়া তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া নিয়া

আসিবার জন্য এক পা আগাইয়া যাইবার ক্লেশ স্বীকার করিবে না।

ক্লৈবের ইহা চূড়ান্ত লক্ষণ। কতকাল তোমরা এইভাবে থাকিবে?

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

তোমার বাড়ীতে গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষ্যে দুই পাশের দুইটী মণ্ডলীর বিশিষ্ট সভ্যগণের আচরণের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহা অনুধাবনযোগ্য। একই শহরে দুইটী মণ্ডলী হওয়াতে তুমি সুখী হও নাই। তুমি চাহিয়াছিলে, দুই অঞ্চলের সদস্যেরাই পূর্ণ আনুগত্য নিয়া মণ্ডলীর কাজ করিয়া যাউক এবং পদাধিকারের প্রশ্নকে গৌণ রাখিয়া কার্য্যক্রমের প্রশ্নকেই প্রাধান্য প্রদান করা হউক। তোমার এই প্রস্তাবে যুক্তির সারবত্তা ছিল।

দুইটী মণ্ডলী হইয়া যাইবার পরে উভয় মণ্ডলী সম্পর্কে তোমার সমদৃষ্টি-নীতিও আমার ভালই লাগিয়াছে। এক মণ্ডলী অপর মণ্ডলীকে নিজের প্রতিযোগী বলিয়া মনে করিবে কেন? উভয় মণ্ডলী পরস্পরের সহযোগী, এই ভাব রাখিয়াই মণ্ডলী দুইটীর চলা উচিত। সেই হিসাবে একই বারে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার দিন না রাখিয়া দুই

মণ্ডলীতে দুই বারে করা সঙ্গত। তাহাতে এক মণ্ডলীর সভ্যদের অন্য মণ্ডলীতে যাইয়া সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগদানের পথ উন্মুক্ত থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে এক মণ্ডলীর সভ্যদের পক্ষে কাছাকাছি স্থানে স্থিত অন্য মণ্ডলীর সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার সুনির্দ্দিষ্ট দিনে সেখানে যাইয়া উপাসনায় যোগদান প্রীতি, মৈত্রী ও ঐক্য বর্দ্ধনের পক্ষে অশেষ সহায়তাপ্রদও হইবে।

তোমাদের মধ্যে সকল কলহের উৎপত্তির কারণ তোমাদের আসল ব্যাপারে নিষ্ঠার অভাব, তাহা হয়ত কেহই ভাবিয়া দেখ নাই। আমি আমার জীবনে সকল মত ও পথকে সম্মান করিয়াছি। আমি আমার সাধনে সকল মন্ত্র ও সকল দেবতাকে সত্য বলিয়া জানিয়াছি। আমি আমার দীক্ষণে সর্ব্বমন্ত্রের সমন্বয়, সমাহার ও সামঞ্জস্যকে অদ্বিতীয় বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি। আমি আমার শিক্ষণ ও প্রচারণে এক-নিষ্ঠার মহিমাই ঘোষণা করিয়াছি। কিন্তু তোমরা একনিষ্ঠ হইতেছ না। তোমরা শত শত জনে নিজ নিজ ঠাকুরঘরকে যাদুঘর বা মিউজিয়ামে পরিণত করিয়া রাখিয়াছ। তোমরা ধ্যানজপে বসিবার আগে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর তেষট্টিকোটি মহাপুরুষের ছবির উপরে চখ বুলাইয়া লও। তোমরা তোমাদের প্রণাম শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি আলম্বনকে স্মরণ করিয়া বিলাইয়া দাও। ফলে তোমাদের ধ্যান কোন্‌ও জায়গায়ই জমে না, তোমাদের জপ কোনও মন্ত্রেই বসে না, তোমাদের প্রণাম কোনও লক্ষ্যেই পৌঁছে না। বহুগামিনী নারীর ন্যায় তোমাদের বহুগামী মন নিয়ত চতুর্দ্দিকে চঞ্চল আঁখি-ঠার দিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু একজনকেও মুগ্ধ করিতে পারিতেছে না, একটী আলম্বনের মধ্য হইতেও পরমপুরুষ জীবন্ত হইয়া তোমাদের

নিকটে ধরা দিতেছেন না, একটী মূর্ত্তিও কথা কহিতেছে না, একটী মন্ত্রও জাগ্রত হইতেছে না, একটী তত্ত্বও আস্বাদনে আসিতেছে না। বহু-মুখতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-ফল এই মূঢ়তা তোমাদের উন্নতির পথ কন্টকিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কর-চরণ শৃঙ্খলিত করিতেছে।

তাই তোমাদের এত দলাদলি।

একবার কি গা-ঝাড়া দিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াইবে? বলিবে যে, আমরা প্রচলিত সংস্কারের ধার আর ধারিব না, গুরুবাক্যই আমাদের নিকটে শাস্ত্র, আমরা পরস্পর-বিরোধী নানা শাস্ত্র-বাক্যের কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার সাগরে বৃথা সন্তরণ করিব না? বলিবে, সকলের জন্যই সকল পথ সত্য হউক কিন্তু আমার জন্য এক মতই মত আর এক পথই পথ? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। রোগাদি নিরাময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সদুপায় হইল ভগবানে নির্ভর। এত বড় উপায় জগতে আর

আবিষ্কৃত হয় নাই। নিরন্তর ভগবানের নামে লাগিয়া থাক। নাম নিমেষের জন্যও ভুলিও না।

দুঃখ ও বিপদে পড়িয়া অনেক সময়ে মানুষের মনে ভগবানের প্রতি দ্রোহভাব আসে। প্রশ্ন জাগে, কি প্রয়োজন ছিল তাঁহার জীবকে সৃষ্টি করিয়া এত দুঃখ দিবার? জীব যদি তিনিই নিজ দায়িত্বে সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে কেন কর্ম্মের ফল তিনি স্বয়ং ভোগ না করিয়া জীবেরা ভোগ করিতেছে? জীবের বুদ্ধিশুদ্ধি যদি তিনিই পরিচালিত করিতেছেন, তবে জীবের স্বতন্ত্র করিয়া দুঃখনিবহ ভুগিবার কি তাৎপর্য্য?

মানুষের মনের এই প্রশ্ন যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানকে নিতান্ত আপন রূপে কাছে পাইবার জন্য, মানুষের মনের ক্ষণিক এই দ্রোহভাব যে প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক্য নহে, তখন মানুষ ইহা বুঝিতে পারে, যখন দুঃখের চূড়ান্ত সীমায় আসিয়া দুঃখের সহিত অভেদরূপে শ্রীভগবানকে দেখিতে পায়। তিনিই সুখ, তিনিই দুঃখ, তিনিই ব্যাধি, তিনিই নিরাময়, তিনিই সম্পদ, তিনিই বিপদ, তিনিই উত্থান, তিনিই পতন, তিনিই আলোক, তিনিই অন্ধকার, তিনিই সৃষ্টি, তিনিই প্রলয়,—ইহা বুঝিতে পারিয়া সকল প্রশ্নের সদ্যঃ সমাধান আসিয়া যায়। তখন নিজেকেও তাঁহার অভেদ জানিয়া জীব নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়, জীব তখন শিব হয়, জীব তখন একমেবাদ্বিতীয়ং পরম ব্রহ্ম হইয়া যায়। স্মৃতির সহায়ে অতীতের পানে তাকাইয়া তখন সে বলে, হে দুঃখ, হে দুর্গতি, হে কষ্ট, হে দুর্ভোগ, হে বিপদ, হে বিপর্য্যয়, সত্যই তোমরা ধন্য, কারণ তোমরা আমাকে আমার প্রকৃত স্বরূপে পৌঁছাইয়া দিলে।

মাত্র তখন এই মায়াময় অলীক জগৎ পূর্ণ সত্যে পরিণত হয়।
ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিবাহ করিয়া সকলে গৃহস্থ হইয়াছ। কিন্তু কেবল গৃহস্থী লইয়াই থাকিও না। আরও কর্ত্তব্য আছে।

তোমারই গৃহের দুয়ারে একটী সৎ-প্রতিষ্ঠান নানা বিঘ্ন-বিপত্তি-দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া কোনও প্রকারে নিজ অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রহিয়াছে। পর পর দুইটী গুরুতর বিভ্রাট তাহার স্বাভাবিক উন্নতিকে ব্যাহত করিয়া দিয়াছে। একটা মহাযুদ্ধের বিভীষিকা ও জাপানী বিমানের আক্রমণ, দ্বিতীয়তঃ দেশবিভাগের বজ্রাঘাত ও যোগাযোগ রক্ষার অসুবিধা। তোমরা প্রতিষ্ঠানটার ঘরের দুয়ারে রহিয়াছ। অনেকে তোমাদিগকে এই প্রতিষ্ঠানের শিষ্য বলিয়াও মনে করে। এই অবস্থায় তোমাদের আচরণ সর্ব্বতোভাবে ইহার সহায়ক হইবে, ইহাই ত' লোকে আশা করিবে।

সংবাদে যাহা জানিতেছি, তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি যে, লোকের সেই আশা তোমরা পূরণ করিবার দিকে লক্ষ্য দাও নাই।

হয়ত বিপরীত দিকেই তোমাদের লক্ষ্য। তোমরা তোমাদের এই সর্ব্বনাশা আচরণ সংযত কর।

ভারত রাষ্ট্র হইতে পূর্ব্ববঙ্গে কর্ম্মী পাঠান সম্ভব নহে, ইহা তোমরা জান। পূর্ব্ববঙ্গের যে দুই একজন কর্ম্মী ইহার পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠানটীতে দায়িত্ব নিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের রহস্যময় আচরণের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে অসমর্থ হইয়াছে। পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে আশ্রমের আয়ব্যয়ের কোনও হিসাব কেন্দ্রে আসে নাই। নিজের আচরণের দ্বারা স্থানীয় অনেক লোকের চখে মানুষ হিসাবেও সে হেয় হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে আশ্রমে রাখিয়া পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে ঐ অঞ্চলের কোনও কাজকর্ম্মের সংবাদ পর্য্যন্ত পাই নাই এবং সেই কর্ম্মী আশ্রম অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়াও গিয়াছিল। অতএব নূতন কর্ম্মী আসিয়া কাজ ধরিতে বাধ্য হইয়াছে।

তোমরা এই নূতন কর্ম্মীটীর গুরুভাই বলিয়া নিজেদিগকে পরিচয় দাও, কিন্তু তাহার সহিত ব্যবহারে পরম শত্রুর ন্যায় আচরণ করিতেছ। আশ্রমের প্রতিবেশী হইয়া আশ্রমেরই জমিজমা সম্পর্কে তাহার সহিত তোমার সংঘর্ষ আসিলে আসিতে পারে, ইহা বিচিত্র নহে। তুমিই আশ্রমের জমি জোর করিয়া দখল করিতেছ না আশ্রমের বর্ত্তমান কর্ম্মী তোমার জমিতে ভুল করিয়া লাঙ্গল চালাইতেছে, এই বিষয়ে বিরোধ আপোষে মীমাংসা করিয়া দিবার যোগ্য লোকের ওখানে অভাব নাই। কিন্তু এই সকল ব্যাপার নিয়া এবং অতি তুচ্ছ অতি সামান্য কথাবার্ত্তা নিয়াও যে তোমরা নিজেদের মধ্যে কল্পনাতীত অসৌহৃদ্য পাকাইয়া বসিয়া আছ, তাহা অবগত হইয়া আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি।

তোমরা কেবল সংসারীই করিতেছ, অন্যান্য বিষয়ে একেবারে অন্ধ থাকিয়া যাইতেছ। আশ্রমকর্ম্মীকে কায়মনোবাক্যে সহায়তা করার মনোবৃত্তি তোমাদের আসা উচিত। মারামারি পিটাপিটি করিলেই বর্ত্তমান কর্ম্মী ভয়ে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, ইহাকে সেরূপ ছেলে বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহাকে সরাইয়া দেওয়া আশ্রমের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়াই যদি তোমাদের অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্য যোগ্য লোক সংগ্রহ কর। তাহার পরে ইহাকে আমি অন্য আশ্রমে সরাইয়া লইয়া আসিব। কিন্তু যেই কর্ম্মীকেই তোমরা মনোনীত কর, মূল আশ্রমের প্রতি তাহার আনুগত্য থাকা চাই, তাহার আর্থিক সততা ও চারিত্রিক সম্পদ সন্দেহের অতীত হওয়া চাই, হরিনাম প্রচারে ও সমবেত উপাসনাদির পূর্ণ নিষ্ঠা পরিরক্ষণে তাহার দৃঢ়তা থাকা চাই। মাদক দ্রব্যে অনভ্যাস এবং স্বল্প সাধারণ ভোজনে তুষ্টি তাহার থাকা চাই। এই কয়টী সদ্‌গুণ থাকিবার পরে যদি দুই একটা সাধারণ ক্ষুদ্র দোষও তাহার থাকে, তবু তেমন কর্ম্মী অবাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু তোমরা তেমন কর্ম্মী জোগাড় করিয়া দিবে কি? পথে ঘাটে একাকী পাইয়া লাঙ্গলের ঈষা নিয়া পিটাইয়া রক্তারক্তি করাই অবাঞ্ছিত কর্ম্মীকে সরাইবার সদুপায় নহে।

একদিন তুমিও তোমার বর্ত্তমান বাসভূমে জমিতে লাঙ্গল ঠেলিবার জন্য থাকিবে না, আশ্রমের বর্ত্তমান কর্ম্মীও নহে। দুইজনেকেই একদিন সেই স্থান ছাড়িয়া অনেক দূরে সরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু সেই দিন লোকের মুখে তোমাদের কীর্ত্তিগাথা থাকিয়া যাইবে। কেহ ভুলিবে না, কে গুরুভাই হইয়াও গুরুভাইকে আহত করিয়া রক্তাক্ত দেহে রাস্তায় অচৈতন্য করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, কে শত মার

খাইয়াও গুরুর আশ্রম রক্ষার জন্য দাঁত দিয়া মাটি কামড়াইয়া রহিয়াছিল। সেই দিন মানুষ তোমার ও তাহার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুক্তি-তর্ক ভুলিয়া যাইবে এবং তোমাদের কাহার পক্ষে কোন্ দলিল-দস্তাবেজ আছে, তাহার বিবরণও বিস্মৃত হইবে। সেই দিন তাহাদের মনে কেবল এই কথাটুকুই থাকিবে,—কে মারিয়াছিল, কে মার খাইয়াছিল, কে মুসলমান প্রতিবেশীদের উত্তেজিত করাইয়া আশ্রমের ভিটি কাটিয়া জমি করিতে প্ররোচনা দিয়াছিল আর কে সরল বুদ্ধিতে এই অপকার্য্যের প্রতীকার করিতে যাইয়া বেদম প্রহারের ফলে সারাদিন রক্তবমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কে কুলোককে সমবেত উপাসনার সময়ে রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া দূর হইতে এক পোটলা মানব-বিষ্ঠা উপাসনার নৈবেদ্যের থালার উপর ছুড়িয়া দিতে কুবুদ্ধি দিয়াছিল আর কে নিজের মুখ-মাথা আগাইয়া দিয়া সেই বিষ্ঠা নিজের উত্তমাঙ্গে ধারণ করিয়া সকলকে বিস্ময়ে হতবাক্ করিয়া দিয়াছিল। মানুষ সেদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহের কারণগুলি একেবারে ভুলিয়া যাইবে কিন্তু এই সকল ঘটনার মধ্য দিয়া যেখানে দেবভাবের যতটুকু জয় হইয়াছে, তাহা স্মরণে রাখিবে। দুষ্কৃতিকারীর পক্ষে সেই দিনটী খুব লোভনীয় নহে।

স্বীকার করি, তোমাদের দু'জনের পারস্পরিক আচরণ সম্প্রতি অত্যন্ত তিক্ত হইয়াছে কিন্তু মনে রাখিও, তোমাদের শাশ্বত সম্বন্ধ সত্য ও প্রেমে প্রতিষ্ঠিত। সেই সম্বন্ধের দিকে তাকাইয়া সরল হও, সাধু হও, দরদী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তুমি যে জীবিকা গ্রহণ করিয়াছিলে, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটাতে তোমার স্বাধীনতা এবং সম্মান উভয়ই বাড়িল। আশীর্ব্বাদ করি, এই নূতন সুযোগকে যোগ্যতার সহিত কাজে আনিয়া প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, ঋদ্ধি এবং বৃদ্ধির পথে অগ্রগামী হইতে থাক।

কিন্তু একটী কথা ভুলিও না। তোমার অপ্রতিষ্ঠিত পরাধীন জীবনে স্থানীয় অখণ্ড-মণ্ডলী তোমার নিকটে যেটুকু সেবা ও ত্যাগের প্রত্যাশা করিত, এখন যেন তুমি তাহাদের প্রত্যাশা করিবার আগেই তাহার দশগুণ দিতে পার। প্রায়ই ইহা দেখা যাইতেছে যে, অপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় যাহারা মণ্ডলীকে অকপট সেবা দিত, সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরে তাহারা সেই দিকে নিজেদের হস্তসঙ্কোচ করে অথচ নেতৃত্ব-কর্ত্তৃত্বের অভ্রংলিহ উচ্চাসন সর্ব্বদাই দাবী করিয়া থাকে। ইহারা জানে না বা জানিয়া শুনিয়াও বুঝিতে চাহে না যে, এইরূপ নেতৃত্বাকাঙ্ক্ষা পাপ। যে যাহা পাইবার যোগ্য শ্রম করে নাই, ত্যাগ স্বীকার করে নাই, সে তাহাই পাইবার জন্য দাবী করিতে গেলে উহাতে ভণ্ডামি হয়। ভণ্ডামি পাপ। এই পাপ যেন তোমাকে স্পর্শমাত্রও করিতে না পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে আমাকে নিতে চাহিয়াছ কিন্তু আমি যে আমার বাণী রূপে আগেই সর্ব্বত্র পৌঁছিয়া থাকিতে চাহি, ইহা কি তোমাদের খেয়ালে আসিতেছে না? আমি যে হরি-ওঁ কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লী-নগর-প্রান্তর পরিক্রমা করিতে থাকি, তাহা কি তোমাদের প্রত্যয়ে আসে নাই? যেখানে দুইটী অকপট ভক্ত সমবেত উপাসনায় বসিয়াছে, আমি যে সেখানে গিয়াই আমার অশরীরী কণ্ঠ তাহাদের কণ্ঠের সহিত মিলাইয়া গাহিতে বসিয়া গিয়াছি "জয় জয় ব্রহ্ম পরাৎপর" ইহা কি দুই চারিবারও তোমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই? আমার কণ্ঠ ত' পেটেন্ট করা কণ্ঠ। একবার শুনিলে এই কণ্ঠ জীবনের মত ভুলিবার উপায় নাই। নাই এই কণ্ঠে জড়তা, নাই এই কণ্ঠে দুর্ব্বলতা, নাই এই কণ্ঠে অস্পষ্টতা। তবু তোমরা তোমাদের অনেক সমবেত উপাসনায় আমার সেই কণ্ঠের অশরীরী ধ্বনি শোন নাই?

এখনই সকল কর্ম্মীদের লইয়া সংগঠনে লাগিয়া যাও। আমার পার্থিব শরীর নিয়া তোমাদের মধ্যে আসিবার আগেই আমি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তোমাদের পাঠে, তোমাদের কীর্ত্তনে, তোমাদের সমবেত উপাসনায় তোমাদিগকে আমার সঙ্গ দিতে চাই। এই কাজ উপযুক্ত ভাবে সমাপনের পরে আমাকে পত্র দিয়া জিজ্ঞাসা করিও

যে, তোমাদের অঞ্চলের জন্য কবে আমি ভ্রমণ-তালিকা তৈরী করিব। সশরীরে আসিলে কয় হাজার ফুলের মালা আমার গলায় দিবে, তাহার আলোচনা বন্ধ করিয়া দলে দলে তোমরা সংগঠনে লাগ। সর্ব্বত্র ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গাও। তবে ত' আমি অল্প শ্রমে অধিক কাজ করিতে পারিব! ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পত্রে অনুযোগ করিয়াছ যে তোমাদের এই জেলা-শহরটীতে আমি আসি না কেন? একেবারে আসি নাই, এমন কথা বলিতে পারিবে না। একবার আমি আসার মত করিয়া আসিয়াছিলাম, টাউন হলে ধারাবাহিক পাঁচ দিন না সাত দিন ভাষণ দিয়াছিলাম। কিন্তু তারপর কি হইয়াছিল বল ত'? পাথর-কাঁকরের বালুকা-বিস্তারে বীজ ছড়াইয়া যাইতে আমার আলস্য ছিল না কিন্তু তোমরা কি আমাকে আর আকর্ষণ করিয়াছ? মাত্র চারিজন সতীর্থ তোমরা সহরটীর মধ্যে আছ কিন্তু ইহা লইয়াই গড়িয়াছ তিনটা দল। তোমাদের পাশের জেলার সদর সহরেও তোমাদের সতীর্থ ছিলেন জনা সাত, তাঁহারাও চারি পাঁচটা দল গড়িয়া বসিয়া আছেন। আমি কি সেখানে গিয়া

তোমাদের গুরুভাইদের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া কতকগুলি নিরীহ লোককে এই দলাদলির পঙ্কিল আবর্ত্তে ফেলিয়া দিব? সকলে মিলিয়া এক হও, সকল দলাদলি বিস্মৃত হও, একে অন্যের দোষ উদ্‌ঘাটনে বিরত হও, পরস্পর পরস্পরের প্রতি সুগভীর প্রেমভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হও, তারপরে আমি তোমাদের দুই জেলার দুই সদর শহরে

আবার আসিব আবার হাসিব
আবার গাহিব গান,
শুধু বলিবারে পরহিততরে
নিজেরে করহ দান। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

তোমার পত্রে তোমার পারিবারিক অবস্থা জানিয়া ব্যথিত হইলাম। পরিবারস্থ সকলে চাহেন যে তুমি উপার্জ্জন করিয়া টাকা আনিয়া দাও, আর তুমি কোথাও চাকুরী পাইতেছ না বলিয়া বিষম উদ্বিগ্ন হইয়াছ।

আমি বলি, আত্মাভিমান ছাড়। ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া তোমাকে কেরাণীগিরিই করিতে হইবে, ইহার কি অর্থ থাকিতে

পারে? কেরাণীগিরি ত' পাওয়া যায় না। তুমি তোমার শহরের রেলষ্টশানের বাহিরে গিয়া সেই স্থানে দাঁড়াও, যেখানে দাঁড়াইতে লাইসেন্স নিতে হয় না। যাত্রীদের লট-বহর বহন করিতে আরম্ভ কর। দৈনিক দুই এক টাকা যাহা পাও, তাহাকেই ভগবানের পরম করুণার দান বলিয়া গ্রহণ কর এবং এই কাজই করিয়া যাও বিপুল নিষ্ঠায়। কিছুকাল গেলে একখানা সাইকেল-রিক্শ কিনিবার ক্ষমতা তোমার হইবে। তখন শ্রম হইবে লঘুতর, উপার্জ্জন হইবে অধিক। আরও কিছুকাল কাজ করিবার পরে একখানা মটর-গাড়ী কিনিবার তোমার সামর্থ্য আসিবে। তখন মাহিনা-করা ড্রাইভার রাখিয়া এবং নিজে তাহার সহিত ক্লিনারের কাজে থাকিয়া উপায় আরও বেশী হইবে।

মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা একেবারে দূর করিয়া দাও যে, ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়াই কুলীগিরি তুমি করিতে পার না, দিন-মজুর তুমি খাটিতে পার না। পুপুন্‌কী আশ্রমে ধান-রোপার সময়ে আমার সঙ্গে যে কয়দিন বাস করিয়াছিলে, আমি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের কোমল-দেহ একটী সন্তান হইয়াও শ্রমসাধ্য কাজে তোমার অরুচি নাই, অসামর্থ্যও নাই। আমি, সাধনা, সংহিতা, নিতাই, অঞ্জন প্রভৃতি মার্জ্জিতরুচি ভদ্রঘরের পুত্রকন্যারা যখন প্রবল বৃষ্টিতে ভিজিয়া পিচ্ছিল কর্দ্দমে আছাড় পড়িতে পড়িতেও দিনের পর দিন গ্রাম্য কুলী-কামিনদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বীজতলা হইতে ধানের গোছা তুলিতেছিলাম, কাঁধে করিয়া ক্ষেত্রান্তরে বহন করিয়া নিতেছিলাম আর ঘন্টার পর ঘন্টা মেরুদণ্ডকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া ক্ষীরবৎ গাঢ় কাদায় সেই সকল ধানের চারা রোপণ

করিতেছিলাম, তখন ত' শ্রমিক হিসাবে তোমার যোগ্যতার কিছু অভাব দেখি নাই! শ্রম করিয়া বাঁচিবার পক্ষে অতিরিক্ত কোনও যোগ্যতার তোমার প্রয়োজন নাই। তোমার প্রয়োজন হইতেছে শুধু আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দেওয়ার।

যাহারা কুলীগিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সমাজের লোক তাহাদের ঘৃণা করে। এই ঘৃণা অকারণ। জগতে কোনও শ্রমই অসম্মানের নহে। শ্রমার্জ্জিত অন্নে যে জীবন-ধারণ করে, সে ভিখারী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

অন্তরে অন্তরে এই কুলীদের প্রতি প্রেমের অনুশীলন কর। যে যাহাকে ভালবাসিতে পারে, তাহার বৃত্তির প্রতি তাহার বিরক্তি কমিয়া যায়, শ্রদ্ধা আসে। কুলীকে ভালবাসিতে পারিলে কুলীগিরি আর ঘৃণার বস্তু থাকে না, মুচিকে ভালবাসিতে পারিলে জুতা সেলাইকে আর নিকৃষ্ট কাজ বলিয়া মনে হয় না, মেথরকে ভালবাসিতে পারিলে লোকের বাড়ীর মল পরিষ্কার করিতে অন্নপ্রাশনের ভাত উল্টাইয়া আসিবে না।

ছোটদিগকে ভালবাস। এই কাজটা তোমরা ভদ্রলোকের ছেলেরা চিরকালই করিতে বিরত রহিয়াছ। ছোটরাও যে স্নেহ-ভালবাসার পাত্র, ইহা কখনও চিন্তাই কর নাই। এই জন্যই আজ তথাকথিত ছোটদের বৃত্তি ধরিতে মনে তোমাদের কুণ্ঠার অন্ত নাই। চুরি করিয়া পেট চালাইবার পরিবর্ত্তে লোকের জুতা ব্রাশ করিয়া জীবন-ধারণ অনেক অধিক সম্মানজনক। ভিক্ষা করিয়া খাইবার পরিবর্ত্তে লোকের পাইখানা পরিষ্কার করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন অনেক অধিক মর্য্যাদাবর্দ্ধক।

দেশব্যাপী অন্ন-সমস্যার দিকে তাকাইয়া আমি আশ্রমের কর্ম্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া পর পর তিনটা অর্থনৈতিক যৌথ মূলধনের

বিরাট সংস্থা গড়িয়াছিলাম। প্রত্যেকটারই কর্ম্মারম্ভ খুব সুন্দর ভাবে হইয়াছিল। অপর সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি এইগুলির জন্য আপ্রাণ শ্রম করিয়াছিলাম। প্রত্যহ ভোর রাত্রি চারিটায় কাজ আরম্ভ করিয়া পরদিন রাত্রি একটায় কার্য্য সমাপন করিয়াছি। এই ভাবে বহু বৎসর ব্যাপিয়া অক্লান্ত শ্রম করিয়াছিলাম। দৈনিক মাত্র দুই ঘন্টার বেশী নিদ্রা যাই নাই। স্বাস্থ্য, শক্তি এবং বুদ্ধি নিঃশেষে উহাতে সমর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এত শ্রমের পরেও সংস্থা তিনটা টিকিল না। মহাযুদ্ধ এবং দেশ-বিভাগ তাহার মুখ্য কারণ হইলেও গৌণ কারণ কয়টা তুচ্ছ করিবার মত নহে। আমার অগণিত সহকর্ম্মীদের মধ্যে দায়িত্ব-ভার-প্রাপ্ত অনেকে সততা রক্ষা করে নাই। কাহারও কাহারও নিষ্ঠাচ্যুতি গুরুতর ক্ষতির কারণ হইয়াছে। কেহ কেহ সংস্থার অর্থে জীবিকার্জ্জন করিয়া গ্রামে গ্রামে সংস্থারই বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিয়াছে। কেহ কেহ অপরাপরকে বিরাট বিরাট চৌর্য্যে সহায়তা করিয়াছে। অনেকে ঘরের ইন্দূর হইয়া বেড়ার বাঁধ কাটিয়াছে। এত বিপর্য্যয়কর বিভ্রাটের পরেও সংস্থা তিনটাকে আমি জোর করিয়া চালাইয়া লইয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু দুর্জ্জয় লোভী বাটপার আসিয়া সংস্থাগুলির শেষ সম্বল ছোঁ মারিয়া লুটিয়া লইয়া গেল। মানব-চরিত্র এত নীচে নামিয়াছে যে, আজ পিতা পুত্রকে, গুরু শিষ্যকে বিশ্বাস করিতে পারে না। নতুবা আমার বিগত সতের আঠারো বৎসরের এই অর্থনৈতিক প্রয়াস আজ দশ হাজার পরিবারের উদরান্নের ব্যবস্থা করিতে পারিত। আমি অভিক্ষায় বিশ্বাসী। সুতরাং চাঁদার বা ভিক্ষার পথে যাইবার কল্পনা করিতে পারি নাই। স্বাবলম্বনের পথেই তিনটী বিরাট অর্থনৈতিক সংস্থা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া যাইত।

কিন্তু এই তিনটী প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া জীবনের সতের আঠারো বৎসরের পরমায়ু মিথ্যা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই হতাশ আমি হই নাই। এখনও আমি বিশ্বাস করি যে, ক্ষুদ্রের মধ্যেই বৃহৎ শক্তি নিহিত আছে। তাই আমি পরিত্যক্ত বৃহৎ পরিকল্পনাকে অযাচক আশ্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ভাবে নূতন করিয়া রূপ দিতে সুরু করিয়াছি। শ্রমে আমার বিরক্তি নাই। ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি। আবার আঠার বৎসর প্রতীক্ষা কর। মুলধনের আমার অভাব আছে। কিন্তু দশ হাজার পরিবার না পারি, পাঁচ হাজার পরিবারের হইলেও, অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হইবেই। কিন্তু ততদিন কি তুমি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে? সুতরাং হাতের কাছে যেই ছোট কাজটীই পাও না কেন, তাহাই ধর। মুটেগিরিকে তোমরা অবজ্ঞেয় বলিয়া জ্ঞান করিও না। মুটেরাও মানুষ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গৃহে থাকিয়া গৃহ-কর্ম্ম সম্পাদন করাই তোমাদের অধিকাংশের পক্ষে সঙ্গত। সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবা করিবে। আশ্রমে চলিয়া

আসিবার জন্য তোমরা অনেকেই ত' অত্যন্ত ব্যাকুল। কিন্তু ইহা কি জান যে, ইহা অযাচক আশ্রম? এখানে প্রত্যেক অন্তেবাসীকে নিজের অন্ন নিজে অর্জ্জন করিয়া নিতে হয়। আমি অবশ্য মুষ্টি-ভিক্ষা প্রচলন করিয়া দশটা স্কুল বা বিশটা ছাত্রাবাস স্থাপন করিতে পারিতাম। কারণ, এই অসামান্য দুর্দ্দিনেও বিদ্যার্থী বা আশ্রমবাসী দেখিলে তাহাকে সপ্তাহে সপ্তাহে মুষ্টি-ভিক্ষা দিবার লোক দেশে এখনও অনেক আছেন। গরীব ছাত্রেরা গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইলে অনেকের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়। গেরুয়াধারী আশ্রমবাসীরা গানের শোভাযাত্রা লইয়া হাজির হইলে এখনও অনেকে চক্ষুলজ্জার দায়ে ঠেকিয়া থাকেন। মানুষের চোখ এখনও মাছের চোখ হইয়া যায় নাই। সুতরাং সেই পথ আশ্রয় করিলে আমি তোমাদের মত কতজনকেই আশ্রমে স্থান দিতে পারিতাম। কিন্তু উহা আমার পথ নহে। এই জন্যই আশ্রমে আসিতে তোমাকে খুব উৎসাহিত করিতে পারিতেছি না।

তথাপি যদি আস, কঠোর পরিশ্রম করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিও। সমগ্র দিনে বিশ্রাম নাই, এমন শ্রম। ক্ষুধার সময় অন্ন পাইবে কিন্তু রাত্রের আগে বিশ্রাম পাইবে না। রাত্রিতেও কখনও কখনও এগারটা পর্য্যন্ত মাঠের কাজ হয়। গরীব আশ্রম, স্বাবলম্বনের মধ্য দিয়া তাহার গতি, সে ত' কাহারও প্রতি অতিথি বা অভ্যাগতের যোগ্য ব্যবহার করিতে পারে না। এমন কি, কে বড়লোকের ঘরের আদরের দুলাল আর কে বা গরীবের ঘরের অনাদৃত সন্তান, এই পার্থক্য-বিচারও সেখানে নাই। সকলকেই শ্রম করিয়া থাকিতে হয়,

শ্রম করিয়া খাইতে হয়, শ্রম করিয়া ঘুমাইতে হয়, আবার শ্রম করিবার জন্যই ঘুম হইতে উঠিতে হয়। কোনও একটা ভান করিয়া শ্রম হইতে দূরে থাকিবার উপায় কাহারও নাই। এমন আশ্রমে আসিবার তোমার সাহস হইবে কি?

ভবিষ্যতের কর্ম্মীদিগকে হয়ত এত শ্রম করিতে হইবে না। আমরা এতদিন যে শ্রম করিয়া আসিতেছি এবং তোমাদের মতন অনেকে আসিয়া যে শ্রম করিতে থাকিবে, তাহার ফলে ভবিষ্যতের কর্ম্মিগণের দৈহিক শ্রম অনেক কমিয়া যাইবে। মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ তাহাদের বাড়িবে। কিন্তু বর্ত্তমানে যাহারা আসিবে বা আসিতেছে, তাহাদের অকুণ্ঠিত আত্মদান ব্যতীত উহা সম্ভব হইবে না। লোভ নাই, লালসা নাই, কর্ত্তা হইবার স্পৃহা নাই, নাম জাহিরের প্রবৃত্তি নাই—পারিবে এমন ভাবে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে? তিল তিল করিয়া নিজেকে ক্ষয় করিতে হইবে, তবে তোমাদের আত্মাহুতির ফল-স্বরূপে যৌবন-শ্রী-মণ্ডিত হইয়া সুষমা-সম্ভারে বিশ্ব বিপ্লাবিত করিয়া রূপ-গৌরব-জ্যোৎস্নায় ভূতল উদ্ভাসিত করিয়া প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করিবে। পারিবে এভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে? যদি পার, শ্রাবণ মাসের পয়লা তারিখ পুপুন্‌কী আশ্রমে হাজির হইবে। পুপুন্‌কীতে আসিবার ইহাই সর্ব্বোত্তম সময়। তারপরে যোগ্যতায় টিকিয়া গেলে ছয় মাস পরে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। অকৃত্রিম অনুতাপের দ্বারা অতীত পাপের বিনাশ কর। অকপট বিনয়ের দ্বারা সতীর্থদিগকে অনুকূল কর। সকলের প্রেম-ভালবাসা পাইবার জন্য নিজের অন্তরে বিমল প্রেম-ভালবাসার সৃষ্টি কর।

ভুল-ভ্রান্তি মানুষেই করে, মানুষেই আবার আত্মশোধন করে। হাসিতে হাসিতে জীবন সুরু করিয়াছিলে, কাঁদিতে কাঁদিতে যৌবন কাটাইতেছ। বুদ্ধি-বিভ্রম বশতঃ লোকের কাছে মান-সম্মান হারাইয়াছ। যাহা করিবার নহে, তাহাই করিয়া নিজের মূল্য কমাইয়া দিয়াছ। তথাপি সঙ্কল্প কর, জীবন আবার নূতন করিয়া গড়িয়া লইবে। মানুষের অসাধ্য সাধনা নাই। যত্ন করিলে সর্ব্বসিদ্ধি তাহার করতলগত হইয়া থাকে। তোমার বাকী জীবনটুকুকে তুমি বৃথা যাইতে দিবে না, এই সঙ্কল্প কর। আবার তোমার মুখে হাসি ফোটান চাই।

যাহাদের নিকটে অপরাধ করিয়াছ, বিশেষ করিয়া যাহাকে বা যে কয়জনকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছ, তাহাদের নিকটে অকপটে ক্ষমা-প্রার্থনা কর। প্রকাশ্যে ক্ষমা-প্রার্থনার পূর্ব্বে স্বভাবটিকে এমন কর, যেন তোমার ক্ষমা-প্রার্ধনাকে অকৃত্রিম বলিয়া তাহারা মানিতে বাধ্য হয়। তুমি চাহিবে ক্ষমা আর তাহারা ভাবিবে যে তুমি কপটতা করিতেছ, এইরূপ ঘটিলে তোমার ক্ষমা-প্রার্থনা মাঠে যারা গেল এবং নূতন হাসির খোরাক যোগাইল মাত্র। ক্ষমা চাওয়ার মানে কি?

তাহা এই যে, তুমি তোমার অতীত আচরণের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছ এবং এইরূপ আচরণ যে আর করিবে না, তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছ,—তোমার প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য তুমি সদা-সতর্ক এবং প্রয়াসপরায়ণ থাকিতে প্রস্তুত হইয়াছ। তোমার ভিতরে এই প্রস্তুতি আসিলে তারপরে ক্ষমা চাহিবার যোগ্যতা জন্মে। লোকদেখান ক্ষমা চাহিয়া নিজের মনুষ্যত্বকে হেয় করার কোনও অর্থ হয় না। সত্য সত্যই অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা চাহিলে, ক্ষমা যদি নাও মিলে, তথাপি চিত্ত-শুদ্ধি রূপ পরম সম্পদ তুমি অর্জ্জন করিলে। চিত্ত যদি শুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই ভবিষ্যৎ জীবন সুনিশ্চিত ও অনাবিল হইয়া গেল। নিজেকে হেয় করা বা অপরের প্রতিশোধ-স্পৃহাকে তৃপ্ত করিয়া তাহার দর্পদম্ভে রশদ্ যোগানই ক্ষমা-প্রার্থনার লক্ষ্য নহে।

সর্ব্বাগ্রে ক্ষমা চাহিয়া লও তোমার দেহের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিকটে, তোমার প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের কাছে। ইহারা তোমার হাতের যন্ত্র আর তুমি ইহাদিগকে বেপরোয়া ভাবে ব্যবহার করিয়াছ অপকার্য্যে। আদেশ দিলে ইহারা মহৎ কার্য্যও করিতে পারিত। ইহাদের নিজস্ব কোনও ক্ষমতা নাই; তুমি ইহাদিগকে যেমন করিয়া চালাইতেছ, ইহারা তেমনভাবেই চলিতেছে। তুমি ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিয়োগ না করিয়া অপকৃষ্ট কার্য্যে প্রযোজিত করিয়াছ। ইহারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিপথে চলিয়াছে। তোমার বিচার-বিভ্রমের দরুণ ইহারা কলঙ্কিত হইয়াছে। ইহাদের কলঙ্ক কে ঘুচাইবে? একদিন তোমার মন শুদ্ধ হইবে, তোমার অতীত কুকর্ম্মের স্মৃতি মুছিয়া যাইবে। এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যে কুকাজ করিল, তাহার ইতিহাস মুছিয়া দিবে কে? অতএব ইহাদের নিকটে আগে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

যে নারীটিকে লইয়া তোমার এই বিষম বিভ্রান্তি ঘটিয়াছিল, হয়ত সে নিজেই তোমা অপেক্ষা অনেক অধিক অপরাধিনী। হয়ত তাহার প্ররোচনা না থাকিলে তোমার কুবিষয়ে রতি আসিতই না। হয়ত সে-ই তাহার রিরংসার তাড়নায় তোমার সহিত সুকৌশলে ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে এবং আস্তে আস্তে তোমাকে দুর্ব্বলতার দিকে টানিয়া নিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে ধরা পড়িয়া গেলে মানুষের সাধারণ বিচার-বুদ্ধি এই রায়ই দিবে যে, তুমিই তাহাকে করিয়াছিলে আক্রমণ। এই শ্রেণীর রমণীরা উপভুক্তা হইবার জন্য স্বেচ্ছায় বিপজ্জনক স্থানে পদার্পণ করে। দুর্ঘটনা ঘটুক, ইহা তাহারা চাহে,—কেবল প্ররোচনার দোষটা তাহাদের ঘাড়ে না পড়িলেই হইল। বিপথগামী নারী-চরিত্রের এই একটা অদ্ভুত অবস্থা অনেক সরল-চিত্ত ব্যক্তির মোটেই পরিজ্ঞাত নহে বলিয়া নিরীহ লোকেরা সহজেই জালে জড়াইয়া পড়ে। সূক্ষ্ম বিচারের দিক হইতে দেখিতে গেলে এরূপ ক্ষেত্রে তোমা অপেক্ষা তাহারই অপরাধ অধিক। কিন্তু নিজেকে যখন অপরাধী বলিয়া জানিয়াছ, তখন অপরের অপরাধের পরিমাণ যাচাইয়া তোমার কোনও লাভ নাই। তুমি নিজের অপরাধ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর। অপরের অপরাধ বিচার করিতে বসিও না।

লোকচক্ষে ভাল থাকিবার চেষ্টা অপেক্ষা নিজের নিকটে নিজে ভাল থাকিবার চেষ্টা মহত্তর। সেই চেষ্টায় পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ কর। ঋণ, ব্রণ এবং কলঙ্ক চিরকাল থাকে না। অতএব হতাশায় ঢলিয়া পড়ার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি সাহস সহকারে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন কর। তুমি নিরপরাধ থাকিবার ও নির্দ্দোষ হইবার

অকপট চেষ্টা যে করিতেছ, এই কথাটী অন্তরে জানিলেই তোমার সব কিছু হইয়া গেল। তারপরে অতীতের পানে তাকাইবার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া কেবল বীরবিক্রমে আত্ম-গঠনের পথে চল। অন্যায় অপবাদও যদি নূতন করিয়া সৃষ্টি হইতে থাকে, তবে তাহাতে বিচলিত হইও না। ভবিষ্যৎ জীবন তোমার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। আকাশের বর্ত্তমান ঘনঘটা দেখিয়া আগে হইতেই কেন তুমি একথা ভাবিয়া হাত পা গুটাইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিবে যে, তোমার নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দু' ঘন্টার জন্যই কর বা সপ্তদিবসব্যাপীই কর, সকল অনুষ্ঠানেই প্রাণপণ শক্তিতে প্রস্তুতি প্রয়োজন। একই অনুষ্ঠান দুইবার করিবার সুযোগ তোমাদের নাও হইতে পারে। একদিনব্যাপী অনুষ্ঠান হউক কি মাসব্যাপী অনুষ্ঠান হউক, সব অনুষ্ঠানেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্যটীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্ছৃঙ্খল হৈ-চৈ কোন

সুফল প্রসব করে না। একদিনে সাতটা প্রগ্রাম করিলাম অথচ তিনটা কর্ম্মতালিকাও সুনিষ্পন্ন হইল না, এইরূপ তাড়াহুড়ার কাজে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি বেশী হয়। জগজ্জোড়া প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, তাহার মাঝখানে জয়ী দুই চারিজনই হইতেছে। যাহারা সুশৃঙ্খল, অনলস এবং কর্ম্ম-বিভাগের দ্বারা জটিল কার্য্যের মধ্যেও সরলতা ও সুচারুতা-বিধান করিতে সমর্থ, জয়ী মাত্র তাহারাই হইতেছে। সকলকে দ্রুত কাছে ডাকিয়া আন। সকলের মধ্যে কর্ম্ম-বন্টন কর। কেবল ইচ্ছুক লোকদিগকেই কর্ম্মভার দাও। যে কাজের যে যোগ্য, তাহার উপরে যেন সে কাজেরই ভার পড়ে। সময় যে তোমাদের একেবারেই নাই, একথা যেন তোমাদের প্রতিজনের মনে থাকে। প্রত্যেকে যেন দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে কাজ করিতে চেষ্টিত হয়।

একবার যেই সকল নরনারীর নিকটে ভাবের পসরা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলে, পুনরায় তাহাদের নিকটে যাইতে হইবে। যাহারা তোমাদের ভাব ও আদর্শের সহিত একেবারেই পরিচিত নহে, তাহাদের নিকটেও যাইতে হইবে। একটি মানবাত্মাকেও তোমরা বর্জ্জনীয় বলিয়া জ্ঞান করিও না। ধনি-দরিদ্র, গুণি-নির্গুণ, পণ্ডিত-মূর্খ, কুলীন-অন্ত্যজ বিচার না করিয়া মানুষকে মানুষরূপেই সম্মান দিবে এবং তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিবে। তোমাদের জয়যাত্রা মানবতার জয়যাত্রা। এই কথাটি একটি নিমেষের জন্যও ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে যেখানেই থাক, যেই বিষয়-কর্ম্ম নিয়াই ব্যাপৃত হও, স্থানীয় দশ মাইলের মধ্যে তোমার সমসাধক গুরুভ্রাতা কে কোথায় আছে না আছে, ইহা তোমাকে খুঁজিয়া লইতেই হইবে। নিজেকে সকলের কাছ হইতে বিযুক্ত করিয়া রাখা এক প্রকারের স্বার্থপরতা। অথবা শুদ্ধতর ভাষায় বলিব, ইহা এক প্রকার কূপমণ্ডূকতা। এই কূপমণ্ডূকতা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

তোমরা যে দীক্ষা পাইয়াছ, তাহা জগন্মঙ্গলের দীক্ষা। কেবল একাকী একটী মাত্র আত্মার মুক্তির দীক্ষা ইহা নহে, প্রচলিত সর্ব্ববিধ দীক্ষা-পদ্ধতি হইতে তোমাদের দীক্ষা একেবারে স্বতন্ত্র।

এই স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তোমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। উপাসনা-প্রণালীখানা বারংবার পড়। তাহা হইতে প্রকৃত তাৎপর্য্যটা বুঝিয়া লও। তোমরা শুধু হুজুগেই দীক্ষা নিয়াছ, ইহা আমি মনে করি না। জগতের মঙ্গল-প্রয়োজনে তোমরা আমার কাছে আসিয়াছ। সুতরাং দীক্ষিত হইবার পর অপরাপর সম-দীক্ষিতদের কাছ হইতে তোমরা দূরে সরিয়া থাকিতে পার না। তাহাদিগের সহিত যোগাযোগ রক্ষা কর। তাহাদিগকে লইয়া সমবেত উপাসনা কর। তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে সহায়তা কর। তাহাদের ভক্তি-প্রাণ চিত্ত ও সাধনানুরক্ত মন হইতে নিজেদের জন্য উৎসাহ

সংগ্রহ কর। তাহাদিগকে স্বাবলম্বী শক্তিমান দীপ্ত-পৌরুষ-সম্পন্ন বীর্য্যবান পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সহায়তা কর।

ইহা তোমাদের ঋষি-ঋণ। কারণ, দীক্ষার বিনিময়ে আমি নিজের জন্য তোমাদের কাছে কিছুই চাহি নাই। কিন্তু তোমাদেরই সকলের নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য তোমাদের নিকটে ইহা চাহিয়াছি। ইহা গুরু দক্ষিণারূপে তোমাদের অবশ্য-দেয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ জানিতে চাহিলে আর আমি পত্র দিবার আগেই দেখিলে যে স্বপ্নযোগে আমি তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছি, এই সংবাদে বড়ই সুখী হইলাম। আমার একটা স্বরূপ-মূর্ত্তি আছে, যেই মূর্ত্তিতে জ্ঞানরূপে আমি বিশ্বের সকল বস্তুতে অবস্থান করি,— তোমার হৃদয়েও। তুমি যেইদিন আত্মজ্ঞ হইবে, সেইদিন দেখিতে পাইবে যে, তুমিও এইভাবে সর্ব্বভূতে বিরাজমান এবং তোমাতে আর আমাতে কোনও ভেদ নাই।

তুমি যেই সকল লোকপাবন মহাপুরুষের নাম করিয়াছ, তাঁহাদের প্রতিচিত্রের মধ্যে বারংবার আমাকেই ফুটিয়া উঠিতে দেখিতেছ। চক্ষু

উন্মীলিত অবস্থায় দেখিতে পাইতেছ বলিয়া আরও হৃষ্ট হইয়াছি। তোমার অন্তরের ভাবকে দিনের পর দিন পরিপুষ্ট হইতে দাও। তখন দেখিয়া অবাক্ হইবে যে, সব দেখা এক দেখার মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে। সকলের মধ্যে যখন একজনকে দেখিবে এবং একজনের মধ্যে যখন সকলকে দেখিবে, তখনই তুমি এই জীবনে কৃত-কৃতার্থ হইবে। সেই সুদিন তোমার শীঘ্র আসুক।

স্বপ্নে দীক্ষা পাইয়াছ আবার সে দীক্ষা আমারই কাছে পাইয়াছ, এই সংবাদ প্রীতিজনক। কি মন্ত্রে দীক্ষা পাইয়াছ, তাহা তুমি না লিখিলেও আমি বুঝিয়াছি। সব মন্ত্রকেই সত্য জানিয়া আমি জীবনে বহু মন্ত্রের পর পর সাধনা করিয়াছি এবং সব মন্ত্রের মধ্য দিয়াই একটি মন্ত্র সকলের আধার বলিয়া ধরা পড়িয়াছেন। আমি সেই একটি মন্ত্র ছাড়া দ্বিতীয় মন্ত্রে কাহাকেও দীক্ষা দেই না। তুমি সেই মন্ত্রই পাইয়াছ। যদি স্মরণে থাকিয়া থাকে, তবে ইহাই জপিয়া যাও। কিছুকাল পরে আমি বারাণসী গেলে ছুটী নিয়া আসিয়া বিধিমত দীক্ষা লইয়া যাইও।

কাণপুরে কি তুমি সম-ভাবের-ভাবুক পাইতেছ? অন্তরের ভাব সজীব রাখিতে হইলে সৎলোকের সঙ্গ প্রয়োজন। সৎ-সঙ্গকে কখনও অনাবশ্যক জ্ঞান করিও না। তবে যাহাদের সঙ্গ করিলে মনে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা জাগে, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরবিষয়ে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তেমন লোকেরা সাধক বা শাস্ত্রবিদ্ হইলেও সুদূর হইতেই শ্রদ্ধেয়। তাঁহাদের কাছ-ঘেঁষিতে নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি জন্মোৎসবের সময় কলিকাতা আসিয়া অশেষ লাঞ্ছনা পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছ জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। কিন্তু সে সময় ত' আমি পুপুন্‌কী ছিলাম। গুরুদর্শন করিতে আসিলে দুর্ভোগের জন্য তৈরী হইয়াই আসিতে হয়। কেহ তোমাদের জন্য দুর্ভোগের থালা স্বেচ্ছায় সাজাইয়া রাখে না। তথাপি দৈববশাৎ কাহারও কাহারও দুর্ভোগ হয়। সেই দুর্ভোগ স্মিতমুখে সহিয়াও লইতে হয়।

কেহ কেহ তোমাকে কটুকথাও বলিয়াছে জানিলাম। আমি ত' আমার ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে পুপুন্‌কী ছিলাম। কে তোমাকে কটুকথা কহিল, তাহা ত' নির্ণয় করা গেল না। তোমারই মত উৎসবাগত অপর কোনও ভ্রাতারা তোমাকে হয়ত কটুকথা কহিয়া থাকিবেন। উৎসব যাহারা করিয়াছে তুমিও তাহাদেরই মধ্যে একজন। আমিও করি নাই, আশ্রমের ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণীরাও করে নাই। উৎসব আমাদের অনুপস্থিতেই হইয়াছে। নিজেদের কাজে নিজেরা নিজেদের বাক্যেই আহত হইয়াছ, অভিমান কাহার উপর করিবে?

কলিকাতায় আমার কোন আশ্রম নাই। মাণিকতলা একটা ভাড়াটে বাড়ীতে আসিয়া মাঝে মাঝে থাকি মাত্র। প্রায়ই কলিকাতা আসিতে হয়, অতএব বাড়ীটা ছাড়িতে পারিতেছি না। যখন আমি থাকি, তখন উহা আশ্রম। যখন বাহিরে চলিয়া যাই, তখন উহা

কখন কাহার তত্ত্বাবধানে থাকে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। যাহারা ইচ্ছা করে, তাহারাই আসিয়া উৎসব-আনন্দ করে, হৈ-হল্লা করে, ঝগড়া-ঝাটিও করে। তোমারই ন্যায় নবাগত রবাহুত আগন্তুক সেই সময়ে অনেকেই আসে। একদিনের পাখীরা সব কোন্ সুদূর হইতে উড়িয়া আসিয়া এই গাছটার ডালে বসে, সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিতে না আসিতে আবার উড়িয়া যার যার নীড়ে ফিরিয়া যায়। এখানে কোন্ পাখী কাহার পালকে চঞ্চুর আঘাত করিয়া বসিল আর কাহার একটা পুরাণো পালক শরীর হইতে খসিয়া পড়িল, ইহার খুব গ্রাহ্য করিবার মত কথা নহে। দু'চার হপ্তা পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া এদিকে সেদিকে মার্জ্জার-শিশুকে পরিত্যক্ত পালক লইয়া খেলা করিতে দেখিতে পাই আর ঝাঁটা দিয়া ঝাড়িয়া ধুলা-বালি সহ এই সকল আবর্জ্জনা বাড়ীটা হইতে দূর করিয়া দেই। হয়ত এই সব কথা তোমার জানা নাই। সেজন্যই দুর্জ্জয় অভিমান করিয়াছ।

আমি ত' বাবা অযাচক, স্বাবলম্বনে বিশ্বাসী। সুতরাং এমন হইবার উপায় নাই যে, একদিন সন্ধ্যার সময় ঠাকুর-প্রণাম করিয়া ঘুম দিব আর সকাল বেলা উঠিয়া দেখিব যে, আশ্রমে সাততলা দালান উঠিয়াছে। কলিকাতায় যদি আশ্রম হয়, তাহা হইলেও অনেক সময় লাগিবে। আস্তে আস্তে সব গড়িয়া উঠিবে। একটা ভাড়াটে বাড়ীর ক্ষুদ্র দুইখানা প্রকোষ্ঠে একটা আশ্রমের প্রয়োজন মিটিতে পারে না।

কিন্তু আশ্রম হইলেও অনেক বিপদ আছে। নিয়ম ছাড়া কি আশ্রম চলে, না চলা উচিত? কাশীধামে বিখ্যাত সাধুদের মঠগুলিতে চমৎকার নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত। গুজরাটী শেঠ-শিষ্য হাজারখানা মোহর

লইয়া গুরু-প্রণাম করিতে আসিয়াছেন কিন্তু পৌঁছিয়াছেন বেলা দশটার পর। মঠে আর তাঁহার আহার মিলিল না। বাজারে গিয়া দুপুরের খাওয়া খাইয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পর সময়-মাফিক আসিয়া যদি পৌঁছিতে পারেন, তবে রাত্রের প্রসাদ আশ্রমে পাইবেন। হিন্দুস্থানী সাধুরা মঠ-আশ্রম আদি পরিচালন করেন এত কঠোর নিয়মাদির মধ্য দিয়া। বাহ্য শিষ্টাচার বা সৌজন্যকে তাঁহারা থোড়াই কেয়ার করেন।

বাঙ্গালী সাধুদের মঠ-আশ্রমে কি নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয় না? অতিথিরা অবশ্যই বাঞ্ছিত ব্যক্তি, ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহাদের যদি বুদ্ধি-বিবেচনা কম থাকে, তাহা হইলে আতিথেয়তা প্রদর্শন সকল সময়েই কি সম্ভব? উড়িষ্যার একজন মঠাধীশকে আমি দেখিয়াছি সকাল আটটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত কেবল উনানের লাক্‌ড়ী ঠেলিতে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ধ্যান-জপ ছাড়িয়া দিয়া একি কাণ্ড করিতেছেন?" উত্তরে মহন্তজী বলিলেন,—"যখন তখন অতিথি আসিতেছে, না খাওয়াইলে যে ধর্ম্ম যায়, আতিথেয়তা সকল আশ্রমেরই প্রতিপাল্য।" আমি বলিলাম,—"সন্ন্যাসীর ইহা প্রতিপাল্য ধর্ম্ম নহে, অনেক সন্ন্যাসী নিজের অন্নই নিজে রন্ধন করেন না। অগ্নি বৈদিক দেবতা আর বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাসী সর্ব্ব-বেদবিধি-বহির্ভূত। সুতরাং তিনি অগ্নিস্পর্শ করেন না, ইহাই তাঁহার প্রথা। কিন্তু সে যাহাই হউক, উনান ঠেলার কাজটা আপনার শিষ্যরাও ত' করিতে পারে।" মহন্তজী বলিলেন,—"শিষ্যরা বনে বনে চরিয়া গরু ঠেঙ্গাইতেছে। এই কাজে মনোযোগ হ্রাস পাইলে বাঘে গরু খাইবে আর গরুগুলি মরিয়া গেলে মঠ অচল হইবে। গোধনই মঠের প্রধান ধন। সুতরাং আমাকেই চুলা ঠেলিতে হইতেছে।" আমি বলিলাম,—

"এমন মঠে আমি অতিথি থাকি না। অতিথিকে ভোজন করান যদি মঠাধীশের কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে মঠবাসীদের ক্লেশ কমানও অতিথিদের কর্ত্তব্য। এমন স্থানে অতিথি হইয়া আমি সন্ন্যাসীদের ক্লেশ-বর্দ্ধন করিতে পারি না।"

ঘটনাটি হইতে কিছু বুঝিলে? কত দেশ ঘুরিতেছি, কত আশ্রম দেখিতেছি। কতকগুলি আশ্রম যেমন আশ্রম নামের অযোগ্য, কতকগুলি গৃহস্থও তেমন গৃহস্থ নামের অযোগ্য। অতিথিকে খাওয়াইয়া কতকগুলি আশ্রম জোর করিয়া কাঞ্চন-মূল্য আদায় করিয়া লইতেছে, আবার আশ্রমের অতিথি হইয়া আশ্রমবাসীদিগকে দিয়া হাট করাইয়া, বাজার করাইয়া, রান্না করাইয়া, পরিবেশন করাইয়া, কোন কোন স্থলে বাসন পর্য্যন্ত মাজাইয়া গৃহস্থেরা গুরুদর্শন বা তীর্থদর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে। উভয় আচরণই সমান ধিক্কার যোগ্য।

যেই মঠ বা আশ্রমগুলি কেবল ধ্যান করিবার কুঠুরীতে পর্য্যবসিত নহে, পরন্তু কর্ম্ম করে, সমাজসেবা করে, নানা জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়, মানুষের পারমার্থিক কুশলের সাথে সাথে ঐহিক সুপ্রতিষ্ঠালাভেও সহায়তা করে, স্বভাবতঃই সেই সকল স্থানে আশ্রম-কর্ম্মীরা অতিশ্রমে ক্লান্ত থাকেন। তাঁহাদের উপর নূতন শ্রম চাপাইবার কাহারও মনোবৃত্তি থাকা উচিত নয়।

অন্তরের একটু সহানুভূতি এবং সদ্বিবেচনা লইয়া বিষয়গুলি চিন্তা কর, তাহা হইলে তোমার মনের অনেক ক্লেশ দূর হইয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Created by Mukherjee TK, DHANBAD

(৪৪)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি বারংবার বলিয়াছি যে ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় প্রতিভা। ভারতের মাটীতে ধর্ম্ম ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত, ম্রক্ষিত এবং অনুস্যূত। এখানে ধর্ম্মার্থে যাহাই করিতে যাইবে, তাহাই সফল হইবে। এদেশে 'ক' বলিতে প্রহ্লাদ কৃষ্ণ শুনিয়া বসে। ষণ্ডামর্কের শত কুশিক্ষায়ও সে সংস্কার দূর হয় না।

তোমরা স্থানে স্থানে যাইতেছ, লোকের নিকট চিরপরিচিতের মতন ব্যবহার পাইতেছ, ইহা ত' স্বাভাবিক। কিন্তু একটা বিষয়ে তোমাদিগকে বড় সতর্ক থাকিতে হইবে। ধর্ম্মের নামে এদেশে সকলেই গলিয়া যায়। আবার এই কারণেই ধর্ম্মের নামে অনেক ব্যবসায়, অনেক চোরা কারবার, অনেক ফাট্‌কা-বাজীও চলে। তোমরা সাবধান থাকিও যেন তোমাদের অপরিলক্ষিত অশুদ্ধতা হেতু এইসব দুর্ণাম বা দুর্গতি না আসিতে পারে। ধর্ম্মকে স্বার্থসিদ্ধির উপায় রূপে তোমরা গ্রহণ করিও না।

মানুষকে ফাঁকি দিয়া, মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া, অসত্য অলৌকিক কাহিনী শুনাইয়া, মনগড়া উপন্যাসের ধাঁধাঁয় তাহাদের চোখ ধাঁধাঁইয়া

দিয়া নিজের দলে ভিড়াইবার যে চেষ্টা, তাহা পাপ। মহাপুরুষদের কথা প্রচার করিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে বুদ্ধি-সঙ্গতির অতীতে বড় করিয়া দেখাইবার প্রয়াসও পাপ। ভগবান নিত্যনূতন অবতার হইয়া আসিতেছেন, তুমি বা আমি প্রত্যেকেই তাঁহার অবতার ব্যতীত আর কিছুই নহি, তথাপি ব্যক্তিবিশেষকে বিশিষ্ট এক অবতাররূপে প্রচার করিবার জন্য নানাপ্রকার ছল, চাতুরী ও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া পাপ। সহজ, সরল, স্বাভাবিক বুদ্ধিতে মানুষ বিবেকানুমোদিতভাবে নিজের পথ নিজে বাছিয়া লইবে, ইহাই সুসঙ্গত ব্যবস্থা,—তাহার ব্যত্যয় করিয়া যাহারা প্রলোভন, মিথ্যা ও মাৎসর্য্যের আশ্রয় লইয়া নিজেদের দলপতিকে সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতে হিতাহিত-বুদ্ধি-বর্জ্জিত হইয়া সুজন-বিগর্হিত কুপথ আশ্রয়েও কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদের আচরণ ও অধ্যবসায় পাপ। এই পাপ হইতে তোমাদিগকে প্রমুক্ত থাকিতে হইবে। তোমাদের দলে লোক বাড়িল কিনা, ইহা তোমাদের বিবেচ্য নহে। ঘুমন্ত মানুষের অলস বিবেক নব-জাগৃতির মধ্য দিয়া নিত্য জাগরূক হইয়া উঠিলেন কিনা, মাত্র তাহাই তোমাদের দেখিবার বিষয়।

গৃহে গৃহে যাও, দ্বারে দ্বারে যাও, প্রত্যেকের ঘুমন্ত বিবেককে জাগাইয়া দাও। পৃথিবীর সকল ভালমন্দ নিজে বিচার করিয়া সে গ্রহণ-বর্জ্জন করুক। আমার মত, আমার পথ, আমার ব্যক্তিত্ব, আমার অবতারত্ব তাহার উপরে চাপাইয়া দিও না। আমি স্বাধীনতার শাশ্বত পূজারী। আমি অপরের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করিব না।

কিন্তু তোমাদিগকে যাইতে হইবে প্রত্যেকটী গ্রামে। যাইতে হইবে প্রত্যেকটী ব্যক্তির নিকট। শুনাইতে হইবে আমাদের প্রত্যেকটী কথা। কেবল বলিবে না, "আমাদের পথে এস"। সে নিজের পথ নিজে বাছিয়া লউক। আমাদের কর্ত্তব্যটুকু তাহার সম্পর্কে পূর্ণরূপে হইয়া থাকা চাই। আমাদের দলবৃদ্ধি আমাদের লক্ষ্য নহে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের শ্রীবৃদ্ধি আমাদের লক্ষ্যস্থল। বিবেকবান্ পুরুষেরা একশটা দলে বিভক্ত হইলেও জগতে অশান্তি আসিবে না। অবিবেকী ব্যক্তিরা সকলে একটা দলভুক্ত হইলেও নিজেদের দুর্ম্মতি দ্বারা তাহাকে খণ্ড-বিখণ্ড ও লণ্ডভণ্ড করিবে। দলে আস্থা রাখিও না, বলে আস্থা রাখ। ব্রহ্মবলই বল, অপর সকল বলকে ইহার অধীন রাখ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার অসুস্থতা দ্রুত দূর হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। অসুখে পড়িয়া শরীরের বিশ্রাম পাইয়াছ। এই সময়ে মনটাকে একাগ্র করিয়া

ভগবানের পায়ে লাগাও। এই সময়ে বাজে সংসারী চিন্তা করিয়া নিজেকে উৎপীড়িত করিও না। সুস্থ অবস্থায় তোমরা প্রত্যেকেই এই অভিযোগ করিয়া থাক যে সংসারের সহস্র ঝামেলায় পড়িয়া ভগবানের নাম করিবার সময় মিলে না। অতীতের কর্ম্মক্ষয় করিবার জন্য যখন ভগবানের ইচ্ছায় অসুখেই পড়িয়া গিয়াছ এবং শরীর যখন ইচ্ছা সত্ত্বেও আর কোনও কাজে লাগিতেছে না, তখন মনটাকে নামের সঙ্গ ধরাও। এমন করিয়া ভগবন্নামের সঙ্গ কর যেন অসুখ সারিয়া যাইবার পরেও তাঁর নাম তোমার নিত্য-নিয়ত অভ্যাসগত থাকে। আগন্তুক বিপদকে এই ভাবে সুকৌশলে সম্পদে রূপান্তরিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অনেক কাল ধরিয়া তুমি তোমার স্বাভাবিক কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে রহিয়াছে। ইতিমধ্যে সেই কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা

উপযুক্ত রূপায়ণের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। শুনিলাম, নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে পুনঃ-প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তোমার আসন্ন। এই জন্যই এই পত্রে কয়েকটা কার্য্যকর উপদেশ পরিবেশন করিতেছি।

প্রতি কর্ম্মক্ষেত্রেই কর্ম্মঠ প্রধানগণের বাক্‌সংযমের অভাব একান্ত অকপট কর্ম্মীকেও কর্ম্ম-সান্নিধ্য হইতে দূরে সরাইয়া দিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক সময়ে নেতৃত্ব-ক্ষমতা-সম্পন্ন কাহারও কাহারও ব্যক্তিগত দর্প-দম্ভ অনেক সরলপ্রাণ কর্ম্মীকে ভীতত্রস্ত করিয়া পলায়নপর করে। অথচ একজন মাত্র সহকর্ম্মীকে হারাইলেও সঙ্ঘের ক্ষতি। এই ক্ষতির দিকে তোমাদের অনেকের আদৌ লক্ষ্যই থাকে না। একের জিদের কাছে দশের আত্মসমর্পণ এতই অবমাননাকর যে, এইরূপ প্রয়োজন ঘটিলে বহুজন দূর হইতে কর্ম্মকে প্রণাম করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া অবান্তর কাজে মনোনিবেশ করে। সহকর্ম্মীরা ঐক্যবদ্ধ রহিল না, ইহা যদি তাহাদের ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা হইলে নেতৃস্থানীয়েরা দশের মনের দিকে তাকাইল না, দশের সুযুক্তিকে গ্রাহ্য করিল না, দশের প্রস্তাবিত ভাল কাজকেও আমল দিল না, জোর করিয়া দশের উপরে নিজেদের মতি-বুদ্ধি চাপাইয়া দিতেই কেবল চেষ্টিত রহিল, ইহাও নেতৃত্ব-পরিচালকগণের কম ত্রুটি নহে। তোমার বা আমার আচরণে যদি সহকর্ম্মীদের মনে এই সন্দেহ আসে যে, তুমি বা আমি নিজেদের নেতৃত্বই কেবল পাকা করিবার চেষ্টায় রহিয়াছি, তাহা হইলে সহকর্ম্মীরা প্রাণময় সহযোগ দিতে প্রলুব্ধ হইতে যাইবে কিসের আকর্ষণে?

সকলকে ডাকিয়া আনিয়া তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কর যে, ব্যক্তিগত প্রভুত্বকে জাহির করা তোমাদের একজনেরও সজ্ঞান বা অজ্ঞান প্রয়াস হইবে না। সঙ্ঘের ঐক্যের ভিতর দিয়া সমাজকে সেবা দেওয়াই হইবে তোমাদের লক্ষ্য। সেবা দিতে গিয়া নিজেদের অতি-সম্মান-বোধ তোমরা বিসর্জ্জন দিবে। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপারে তোমরা এতই উত্তেজনা-প্রবণ যে, পান হইতে চুণ খসিলেই মনোমালিন্য আসিয়া যায়। কাহার কত বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিভা বা কর্ম্মশক্তি আছে, তাহার স্বীকৃতি সঙ্ঘের কাজটুকুর মধ্যেই পাইবার চেষ্টা পরিহার করিতে হইবে। প্রতিজনে কতটুকু নিরহঙ্কার সেবা সমাজকে তোমরা দিতে পার, সাত্ত্বিক কর্ত্তব্যপালন করিতে আসিয়া বিচার হইবে শুধু তাহার। নিজের ঘরে তুমি লাট সাহেব থাকিতে পার, নিজের অফিসে তুমি সম্রাট হইতে পার কিন্তু সঙ্ঘের দরবারে তুমি অপর দশ জন সেবকের সহিত সমান একজন সহকর্ম্মী মাত্র। ব্যক্তিত্ব এখানে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, কারণ ব্যক্তিবোধের উগ্রতা না কমিলে অপর দশজনের সহিত মিলিয়া কাজ করিবার তোমার সামর্থ্য আসিবে কি করিয়া?

তোমাদের সহরে কয়েক মাসের মধ্যেই একটা বিশিষ্ট ঘটনা আসিতেছে, সেই ঘটনাটা তোমাদের সঙ্ঘের আদর্শকে জনমনে করিবে অলোপ্য অক্ষরে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেই সময়ে তোমাদের সহরের প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত কম পক্ষে চারি পাঁচটী ধর্ম্মসঙ্ঘ ক্ষেপা ষাঁড়ের

মত হিতাহিতবুদ্ধিবিবর্জ্জিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে তোমাদের গুঁড়াইতে আসিবেন, এমন সম্ভাবনা রহিয়াছে শতকরা নব্বই ভাগ। এই সময়ে তোমাদের হিসাব-নিকাশ হওয়া উচিত যে, কর্ম্মী ও কর্ম্মিণী তোমাদের কত জন আছে। তোমাদের জানা উচিত, কত জনকে তোমরা ঘরে ঘরে পাঠাইয়া মানুষের মন আকর্ষণ করিবার কাজে লাগাইতে পারিবে। এই সকল কর্ম্মী ও কর্ম্মিণীদের মধ্যে কয় জনকে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী সম্ভাবিত কাজে সত্যই পাইবে? এই সকল কর্ম্মী ও কর্ম্মিণীদের মধ্যে কয় জন নিজ নিজ সম্ভাবিত কাজে আগে হইতেই পটু হইয়া আছে আর কয় জনকেই বা উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দিয়া তৈরী করিয়া নিতে হইবে? কতগুলি গুচ্ছে (Batch) ইহাদিগকে ভাগ করিবে এবং সহরের কোন্ কোন্ অংশের কার্য্যভার কোন্ কোন্ গুচ্ছের উপরে ন্যস্ত করিবে? কোন্ কোন্ অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে অকপট কর্ম্মীতে পরিণত করিতে হইবে, তাহাও কি দেখিতে হইবে না?

শুধু ঐ একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যাপারই নহে, যখনই যে অনুষ্ঠানটী কর, তাহাকেই ভবিষ্যতের কোনও চরম সাফল্যের সোপান রূপে ধরিও। উপরে যাহা লিখিলাম, তাহার আলোকে প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানকে দেখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা একখানা প্রস্তরের নূতন বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়াছ এবং তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। এই একটী বিষয়ে তোমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি যে কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেব-বিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন আলাদা পুরোহিতের প্রয়োজন হয়, ওঙ্কার-বিগ্রহ সম্পর্কে তাহা নহে। সমবেত উপাসনার স্থানে বিগ্রহ বসাইয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেই বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। এই সকল বিষয় নিয়া নূতন নূতন সংস্কার তোমরা সৃষ্টি করিও না।

কয়েক বৎসর আগে পূর্ব্ববঙ্গের কোনও একটি সহরের একটি উৎকট ভক্ত একটা প্রচণ্ড আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। পুপুন্কী আশ্রমে সন্ধ্যাকালে কাঁসর এবং ঘন্টা বাজাইয়া ওঙ্কার-বিগ্রহের আরতি কেন করা হয় না এবং আশ্রমের অন্তেবাসীরা সেই সময়ে দুবাহু তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে উদ্দণ্ড নৃত্য কেন করেন না? কিছুদিন আমি এই উদ্‌ভ্রান্ত আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। দেখিলাম উন্মার্গগামী যুবকটী একটী একটী করিয়া তামসিক আমোদপ্রিয় সঙ্গীর সংখ্যা বাড়াইয়া দল ভারী করিতেছে। সুতরাং সুস্পষ্ট ভাবে

নির্দ্দেশ দিতে হইল যে আমার কোনও আশ্রমে কোনও সময়ে ওঙ্কার-বিগ্রহের পৃথক আরতির কোনও প্রয়োজন নাই। ভক্তিভরে "জয় জয় ব্রহ্ম পরাৎপর" স্তোত্র সমস্বরে গাহিলেই বিগ্রহের আরতি হইয়া গেল।

এক এক দেশ হইতে এক এক জন আসিয়া অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইবে আর নিজ নিজ পারিবারিক সংস্কার-অনুযায়ী এক একটা নূতন করিয়া প্রথার সৃষ্টি করিবে, ইহা আমি হইতে দিব না। প্রথার চাপে জর্জ্জরিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অধিকাংশ সাধন-শাখাতে নিজেদের কেন্দ্র-গত মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত-প্রায় হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সাধনাঙ্গগুলি এই ভাবে উপেক্ষিত হইতে হইতে বিশীর্ণকায় হইয়া যাইতেছে আর লক্ষ্যের পরিবর্ত্তে উপলক্ষ্যগুলি দিনের পর দিন নিত্য-নূতন সংযোজনের ফলে বিশাল বপু ধারণ করিতেছে।

চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই ইহাতে বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন হইবার কথা। সাধন-জগতে সর্ব্বসাধারণের উন্নতি যাঁহারা চাহেন, তাঁহারা অনেকেই এই বিষয় নিয়া চিন্তা করিতেছেন। আমি নিজেকে চিন্তায় বিব্রত না রাখিয়া এবং কাহারও মুখপানে না তাকাইয়া নির্লজ্জের মতন কাজে নামিয়া পড়িয়াছি। আমার পক্ষে তোমাদের প্রতিজনের নিত্য-নূতন প্রবর্ত্তনের স্পৃহাকে প্রশ্রয় দেওয়া সুকঠিন।

তোমাদের মণ্ডলীর ভিতরে আমি দুইটী অস্বাস্থ্যকর লক্ষণ লক্ষ্য করিতেছি। প্রথমটী এই যে, তোমরা একজন হয়ত মণ্ডলী-স্থাপনে

সকলের অপেক্ষা অগ্রণী ছিলে, সেই একজনের আগে অপর কেহ এস্থানে মণ্ডলী-স্থাপনের কল্পনাও করে নাই। মণ্ডলী-স্থাপন-বিষয়ে নিজের এই কালগত কৌলীন্যকে অবলম্বন করিয়া এক প্রকারের আত্মাভিমান পোষণ করা হইতেছে। এই আত্মাভিমান বারংবার কাণে কাণে ফুসলাইয়া যাইতেছে,—"তুই হইলি মণ্ডলীর আদি স্রষ্টা, তোর আব্দার সর্ব্বব্যাপারে পরিরক্ষিত হইবে না?" এই আত্মাভিমান সংঘের ঐক্য-সম্ভাবনাগুলিকে কেবলই বিশ্লিষ্ট করিয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় লক্ষণটী এই যে, কোনও একটা বিষয়ে মত-পার্থক্য ঘটিলে তাহা দেখিতে না দেখিতে তুমুল বাদবিতণ্ডায় পরিণত হইয়া যাইতেছে এবং এই তর্কাতর্কি-জনিত মনোবিক্ষোভ তোমরা মজ্জাগত অসন্তোষ রূপে অন্তরের ভিতরে সযত্নে সংবর্দ্ধন করিয়া চলিতেছ।

এই দুইটীই তোমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। তুমি যদি দূরদেশ হইতে আসিয়া সকলের আগেই এখানে মণ্ডলী-স্থাপন করিয়া থাক, তাহা হইলেও অপর দশ জনের সহায়তা ব্যতীত একটা মণ্ডলী গঠিত হইতেও পারে নাই, চলিতেও পারে নাই। সুতরাং মণ্ডলীকে যদি কৃতজ্ঞ থাকিতে হয়, তাহা হইলে ইনি কেবল তোমার নিকটেই কৃতজ্ঞ থাকিবেন না, ইঁহাকে কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে সকল সদস্যেরই নিকট। তোমরা মণ্ডলী গড়িয়া কৃতার্থ হইয়াছ, এই বোধ না রাখিয়া, একটা বাহাদুরি করিয়াছ, এই বোধ যদি রাখ, তাহা হইলে এই মণ্ডলী কোনও সময়েই তোমাদের দ্বারা উপকৃত হইবেন না। সেবাবুদ্ধি লইয়া যাহারা মণ্ডলী গড়িবে এবং মণ্ডলীর কাজ করিবে, মণ্ডলীর প্রকৃত উপকার তাহারাই করিবে।

উপাসনার মতন পবিত্র ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া ঝগড়া করা সত্যই অতীব শোচনীয়। এক একটা উপাসনায় বসিবার কালেই সঙ্কল্প করিবে যে, অতীতে যাহার সহিত যত কলহই হইয়া থাকুক না কেন, সবই তুমি এখন ভুলিয়া যাইতেছ। উপাসনা তোমাকে দিবে উদারতা, ক্ষমা এবং ধৈর্য্য। উপাসনার পরে আবার ঝগড়া-কলহ থাকিবে কেন? উপাসনাকে শান্তির আধার বলিয়া মনে করিও। উপাসনাকে লোক-দেখান হট্টগোল রূপে না নিয়া দেহ-মন-প্রাণের আরাম বলিয়া জানিও। উপাসনাকে কুলাচার, লোকাচার, দেশাচার হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিও।

সহরের দুই অংশে দুইটা মণ্ডলী করিয়াছ, বেশ করিয়াছ। এক মণ্ডলীতে যদি মঙ্গলবার সমবেত উপাসনার দিন হইয়া থাকে, অপর মণ্ডলীতে অফিস-ছুটির দিন বা বৃহস্পতিবার হইতে পারে। মঙ্গলবার আমার জন্মবার বলিয়া সকল স্থানেই জোর করিয়া মঙ্গলবারেই উপাসনা করিবার নিয়ম করিবে, এই কথাটা আমি পছন্দ করিলাম না। আমি আমার মাতৃগর্ভ হইতে সাত দিন ধরিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিয়াছি, মাতৃদেবী সাত দিন সাত রাত্র জুড়িয়া যম-যন্ত্রণা ভুগিয়াছেন। জন্মিলে আমি যে-কোন বারেই জন্মিতে পারিতাম। যে-কোন বারই আমার জন্মবার হইতে পারিত। মঙ্গলবারকে বিশেষত্ব দিতে চাও, দাও, আপত্তি নাই, কিন্তু অন্যবারগুলি ইতর হইল কিসে? সব বারই আমার বার, সব দিনই আমার দিন, সব তিথি এবং সব নক্ষত্রই আমার তিথি এবং আমার নক্ষত্র। আবহমান কাল ধরিয়া প্রবাহিত হইতেছে যে কাল-প্রবাহিনী, তাহার আদি, মধ্য, অন্ত সবই

আমার অস্তিত্ব দিয়া ওতপ্রোত। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্রের আমিই স্রষ্টা এবং বিধাতা। আমাকে আলাদা করিয়া দেখিয়া, ছোট করিয়া মাপিয়া, বিশেষ ভাবে একটা নর-বপুর পূজা-প্রবর্ত্তনের সুকৌশল চেষ্টা হইতে তোমরা বিরত থাকিও। তোমাদের প্রতিজনের মধ্যেও আমিই আছি। তোমাদের প্রতিজনের জন্মবারও আমারই জন্মবার।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা পরিহার কর। উপাসনা-যোগে এবং কর্ম্মসাধনার মধ্য দিয়া পরমেশ্বরের সহিত তোমার যেখানে হইতেছে ঐক্য-সংসাধন, তাহার দিকে দাও প্রখর দৃষ্টি। মণ্ডলীর কে হইল সভাপতি, কে হইল সম্পাদক, কে হইল কোষাধ্যক্ষ আর কে হইল মাত্র দীনাতিদীন পত্রবাহক, দিবানিশি বামহস্তে তুলাদণ্ড ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে ওজনের বাটখারা মাপিয়া তহা লইয়া ব্যস্ত-বিব্রত থাকিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

জপনীয় বীজমন্ত্র কোন অবস্থাতেই উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ বিধেয় নহে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, জপনীয় বীজ গোপন না রাখিলে জপের নিবিষ্টতা ও একাগ্রতা হ্রাস পায়।

সকল বীজমন্ত্র সম্পর্কে ইহা সত্য। কিন্তু প্রণব যাঁহাদের দীক্ষাপ্রাপ্ত জপনীয় মন্ত্র নহে, তাঁহারাও প্রণব মন্ত্র কখনও মুখে উচ্চারণ করেন না। ইহার কারণ এই যে, প্রণব সর্ব্ববীজেরও বীজ। ক্রীং যাঁহার দীক্ষাপ্রাপ্ত মন্ত্র নহে বা শ্রীং যাঁহার জপনীয় নাম নহে, তিনি যদি এই এই বীজ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করেন, তবে তাহাতে গুরুতর দোষ ধরা হয় না। কিন্তু প্রণব (ওঁ) যাঁহার দীক্ষাপ্রাপ্ত নাম নহে, তিনিও উপরিলিখিত কারণে উচ্চৈঃস্বরে ইহা উচ্চারণ করেন না। যিনি যেই বীজই ইষ্টমন্ত্র রূপে জপুন, তাঁহার বীজেরও বীজ হইতেছেন এই প্রণব।

কিন্তু প্রণব যখন অন্য কোন মন্ত্রের অংশ, তখন তাহা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণে বাধা নাই। স্তোত্রাদির সহিত প্রণব উচ্চারণ এইজন্য উচ্চৈঃস্বরেই চলিয়া থাকে। প্রণব যখন তোমাদের হরিওঁ-কীর্ত্তনের অংশ, তখন এই নামের সঙ্গে প্রণব উচ্চারণে দোষ নাই।

ধ্যানকালে প্রণবকে ভ্রূমধ্যে কল্পনায় আনিতে পারিতেছ না বলিয়া লিখিয়াছ। কিছুকাল প্রণব-বিগ্রহের দিকে একাগ্র লক্ষ্যে তাকাইয়া থাকিয়া তাহার পরে ধ্যান সুরু করিলে এই অসুবিধা হয় না। চক্ষুর ভিতরে ভগবান এমন একটা ধারণ-শক্তি দিয়া রাখিয়াছেন যে, কোনও বস্তুর প্রতি কিছুকাল তাকাইয়া থাকিলে চোখ ফিরাইবার বা বুজিবার পরেও সেই দৃশ্যটি কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত স্মৃতিতে ভাসিতে থাকে।

চক্ষুর এই ক্ষমতা আছে বলিয়াই সিনেমা আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। নিয়তপরিবর্ত্তনশীল ছবিগুলি কেবল চলিতেই থাকে কিন্তু অপসৃয়মান ছবিখানার স্মৃতিতে চক্ষু কিছুকাল ধরিয়া রাখিতে পারে বলিয়াই আগম্যমান ছবির সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া হাজার হাজার টুক্‌রা ছবিকে একটা বিরাট চলন্ত ছবি রূপে ধরিয়া লওয়া সম্ভব। এক সময়ে ত্রাটক-যোগের বিশেষ প্রচলন এই দেশে ছিল। তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাহিরের দৃশ্যমান চিত্রকে অন্তরে স্থাপন।

তুমি মাঝে মাঝে নানাপ্রকার জ্যোতিরাদি দর্শন করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। এইগুলি মনঃস্থৈর্য্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থার সূচক। ইহাতে আনন্দিত হইবার কারণ আছে কিন্তু উল্লসিত হইও না। ইহাকেই অনেকে চূড়ান্ত ব্রহ্মদর্শন বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। জ্যোতিরাদি দর্শনের সহিত যখন অন্তরে বিমল আনন্দের উন্মেষ হইতে থাকে এবং সমসাময়িক কালে যখন স্বভাবের রূঢ়তা কমিয়া কোমলতা, করুণা, প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ, দয়া, ভালবাসা প্রভৃতি আপনা-আপনি চরিত্র-মধ্যে প্রতিফলিত হইতে থাকে, তখন বুঝিবে যে, কিছু কিছু আগাইতেছ। এই অগ্রগমনের খবর বন্ধুবান্ধবদের কাছে প্রকাশ করিলে অহমিকা আসে। তাহা সাধন-পথে নূতন নূতন ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। সুতরাং আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইতে থাকে। একেবারে ফতুর হইয়া যাইবার পরে খেয়াল হয় যে, ভুল করা হইয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

Created by Mukherjee TK, DHANBAD

(৪৯)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সাধারণ অবস্থায় ছোট ছেলেমেয়েদের দীক্ষা দেওয়া উচিত নয়। কারণ তাহারা দীক্ষার উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝিতে পারে না। কিন্তু যেখানে পারিবারিক পরিস্থিতি অনুকূল, যেখানে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বুঝাইয়া দিবার জন্য পিতা, মাতা বা ভ্রাতারা আছেন, সেখানে ছোট ছোট বালকবালিকাদিগকে দীক্ষা দেওয়া ভাল কথাই। বাল্যেই যাহার জীবনে সাধনা সুরু হয়, সে পরম ভাগ্যবান। আগেকার দিনে আট বৎসর বয়সেই ছেলেকে গুরুগৃহে পাঠান হইত। শুধু গরুর ঘাস কাটিবার জন্যই পাঠান হইত না, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য পাঠান হইত। গরুর ঘাস কাটা, পশুচারণ আর ক্ষেতের আইল বাঁধা প্রভৃতি গৌণ কর্ত্তব্য মাত্র ছিল।

তোমাদের অঞ্চলে গিয়াছিলাম আর দলে দলে নরনারী দীক্ষিত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের ভীত হইবার কারণ নাই। ঈর্ষ্যারও ত' কোন কারণ দেখিতেছি না। তাঁহারা নিজেরা অনেকেই প্রণব-মন্ত্র জপ করেন না, ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও অধিকাংশেই জপ করিয়া থাকেন হ্রীং, শ্রীং, ঐং, রাং, হুং প্রভৃতি বীজমন্ত্র। তাঁহারা নিজেরা যাহা জপিবেন না, অন্যে তাহা জপিতেছেন জানিয়া গাত্রদাহ হইবে কেন? ইহা অনুচিত।

আমি যাহাকেই যেই মন্ত্র দিয়া থাকি, ব্রাহ্মণদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন সমাজ সৃষ্টি করিতে চাহিতেছি না। যতক্ষণ সদাচার এবং সাধন পরিহার না করিবেন, ততক্ষণ প্রাপ্য পূজা হইতে ব্রাহ্মণদিগকে কে বঞ্চিত করিতে পারিবে? তাঁহারা নিজেদের তপঃপ্রতিভাতেই জগৎপূজ্য থাকিবেন। ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা গেলে সমস্ত হিন্দু জাতিরই মর্য্যাদা নষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণ না থাকিলে সমস্ত জাতিকে পথ দেখাইবে কাহারা? বুদ্ধদেব বেদ মানেন নাই কিন্তু ব্রাহ্মণকে সম্মান করিতেন। ইহা অকারণ নহে।

লোক-নায়কেরা ব্রাহ্মণকে আদর্শ রাখিয়া শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয় পর্য্যন্ত প্রত্যেকের নিজ নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাই হিন্দু-সংস্কৃতির ইতিহাস। ব্রাহ্মণকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা আস্তে আস্তে অস্পৃশ্য অন্ত্যজের পংক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে। ব্রাহ্মণকে ছোট করিয়া দিয়া কাহার কোথায় লাভ? আমি তেমন কাজ করিব কেন?

সুতরাং ব্রাহ্মণদের বৃথা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমার কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া যাঁহারা অবাক্ হইতেছেন, তাঁহারা একটা বিষয় ভুলিয়া যাইতেছেন। তাহা এই যে, আর্য্য ব্রাহ্মণ যখন অনার্য্য জাতির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন নিজের ঘরের সম্পদ বিলাইয়াই পরকে আপন করিয়াছিলেন। অনার্য্যদের আধ্যাত্মিক সম্পত্তিই অনার্য্যদের মধ্যে বিতরণ করিতে বসিলে ব্রাহ্মণদিগকে লোকে দালাল বলিয়া ঘৃণা করিত। তাঁহারা নিজের ঘরের সম্পদ বিলাইবার ঔদার্য্য দেখাইতে

পারিয়াছিলেন বলিয়াই অনার্য্যেরা বিনাযুদ্ধে বা অল্প যুদ্ধে আর্য্যাগোষ্ঠীগুলির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অনার্য্যেরা মানুষই ছিল, জন্তু-জানোয়ার ছিল না। আর, তাহাদেরও যথেষ্ট বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল, তাহারা বোকা ছিল না। তাহারা উত্তম সম্পদ পাইয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করিয়াছিল, পূজা দিয়াছিল। আর্য্য ব্রাহ্মণেরা যে অনার্য্যদের কাছ হইতে কত কিছু ধার করিলেন, সে কথা অনার্য্যেরা এই আনন্দেই একেবারে ভুলিয়া গেল যে, আর্য্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে প্রণব-মন্ত্রের অধিকার দিতে অকৃপণ হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত যথা ঃ— অথর্ব্ববেদ বলিতেছেন, "ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় চ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ভৃত্য ও অরণ (অতিশূদ্র) প্রভৃতিকে চারি বেদের অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণেরা যেই প্রয়োজনে পড়িয়া শূদ্র অতিশূদ্রকেও অর্থাৎ অনার্য্যদিগকেও প্রণবাধিকার দিয়াছিলেন, ঠিক সেই প্রয়োজন আজ দেশে আসিয়াছে। তন্ত্রোক্ত দেবগণের প্রতি লোকের আস্থা ও বিশ্বাস লোপ পাইয়াছে। সামান্য কিছু লোক উৎসবাদির আড়ম্বরে যোগ দেয় দেখিয়াই বুঝিয়া বসিও না যে, ইহারা প্রচলিত দেব-দেবীদের প্রতি আস্থাবান। ইহারা অনেকেই মনে মনে নাস্তিক। ইহারা অনেকেই দেবদেবীর পূজাকে কুসংস্কার বলিয়া মনে করে। আমোদপ্রমোদের অংশ বাদ দিয়া দিলে, বাহ্য আড়ম্বরগুলি তুলিয়া দিলে প্রচলিত অধিকাংশ দেবতার পূজা কিছুকাল মধ্যেই দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। মুসলমানের একেশ্বরবাদমূলক অত্যুৎকট আন্দোলন,

ব্রাহ্মদের দেবদেবী-বিদ্বেষী প্রচার, খ্রীষ্টানগণের স্বধর্ম্ম-প্রচারে সংঘবদ্ধ আগ্রহ, ভারতীয় দার্শনিক-ভাবাপন্ন মনগুলির মধ্যে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদীদের চিন্তার অনুপ্রবেশ এবং সর্ব্বশেষে প্রকৃত বৈদান্তিকদের ব্রহ্মবিচারমূলক বিশুদ্ধ আলোচনা চতুর্দ্দিক হইতে অগণিত নরনারীর মনের চিন্তাধারাকে প্রচলিত প্রবাহ হইতে দূরে সরাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে।

এই সময়ে শক্তিগর্ভ নূতন উপায়নের প্রয়োজন। আমি সেই প্রয়োজনই মিটাইতে আসিয়াছি। আমি স্বোপার্জ্জিত অধিকারেই এই কার্য্য করিয়া যাইতেছি। আমার গতিরোধ করিবার ক্ষমতা কোনো ব্রাহ্মণের নাই, কোনো শাস্ত্র-বচনের নাই। আমি আমার কার্য্য-সম্পাদন করিয়া যাইবার পরে আমার আচরণকে সমর্থন করিবার জন্য নূতন নূতন শাস্ত্রকারেরা নূতন নূতন শাস্ত্র-বচন রচনা করিবেন এবং পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসীরা আমার কর্ম্মের অনুকূলভাবে পুরাতন শাস্ত্র বচনের নূতন ভাষ্য, নূতন টীকা লিখিবেন। তোমরা কয়েকজন সংস্কারাবদ্ধ, অনুদারবুদ্ধি, সময়োচিত কার্য্য তথা যুগধর্ম্ম সম্পর্কে দৃষ্টিহীন ব্রাহ্মণ-সন্তানের টিকির আস্ফালন দেখিয়া ভয় পাইয়া যাইও না। ইঁহারা সকল ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি নহেন। আমি সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেই আসিয়াছ, ধ্বংস করিতে নহে। প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা ইহা একদিন বুঝিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সুরাপানের কদভ্যাস তোমার জীবনকে ধ্বংস করিতে চলিয়াছিল। তোমার সতী সাধ্বী পত্নী অনেক বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়া তোমাকে শিলচর নিয়া আসিলেন দীক্ষা নিতে। দীক্ষা তুমি পাইলে এবং সকলে সবিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল, তুমি চিরাভ্যস্ত সুরাপান একেবারে পরিহার করিয়াছ।

তোমার জীবনের এই ঘটনাটি একটী অদ্বিতীয় ব্যাপার নহে। আরও কত দারুণ মদ্যপ দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই মদ ছাড়িয়াছে। কলিয়ারীর সাহেব-ম্যানেজার ভয় দেখাইয়াও যে ফোরম্যানকে মদ ছাড়াইতে পারে নাই, তেমন ব্যক্তি একটা দীক্ষা-মন্ত্র পাইয়া এক নিমেষে পনের বৎসরের পুরাতন কদভ্যাস ত্যাগ করিয়াছে, জীবনে আর সুরাপাত্র স্পর্শ করে নাই। চল্লিশ বৎসরের পানাসক্ত ডাক্তার একটা দীক্ষা-মন্ত্রের সহায়তা পাইয়া জন্মের মতন কদভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছে। হঠাৎ পানাসক্তি পরিত্যাগের ফলে দেখিতে না দেখিতে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল কিন্তু মৃত্যু পর্য্যন্ত আর পানপাত্র সে ধরে নাই। বিরাট এক কারখানার মদিরাসক্ত উচ্চ কর্ম্মচারী দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সহকর্ম্মীদের নিকটে সন্তরূপে পূজা পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, লুকাইয়াও কখনও মদের দোকানে ঢোকে না। সুতরাং তোমার এই পরিবর্ত্তনের সংবাদে কেহই বিস্মিত হই নাই।

বিস্মিত হইলাম তখন, যখন শুনিলাম আবার তুমি সুরাপান আরম্ভ করিয়াছ।

কিন্তু সুরা তোমাকে ছাড়িতেই হইবে। আমি তোমাকে মদ্যপ দেখিতে পারিব না।

মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন পরনারীতে আসক্ত হয়, তখন সুরাপান পরিহার করা তাহার পক্ষে কঠিন। আমি বুঝিতেছি না, কেন তুমি পুনরায় মদ ধরিলে। মদ্যপানের দ্বারা বিবেককে আচ্ছন্ন না করিলে ব্রহ্মনামে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে পরনারী-স্পর্শ সুকঠিন।

ঐ নারী যতই কুহকিনী হইয়া থাকুক, এখনই তোমাকে তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইবে। তুমি একথা নিজেও যে বুঝ না, তাহা নহে। আমি চাহি, তোমার সমগ্র ইচ্ছাশক্তি তুমি এই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২০শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতেছ বলিয়াই সাধন-বিঘ্ন সমূহে উপদ্রুত হইতেছ, ইহা মনে করিও না। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পালন করিতে আসিলেও

দেখিবে, সাধনে বিঘ্নের অন্ত নাই। কারণ বিঘ্ন সংসারেও নাই, সন্ন্যাসেও নাই। সকল বিঘ্ন রহিয়াছে, তোমার মনে। মনকে নিয়ত ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিতে থাক। বিঘ্নরূপী ভূতপ্রেত আপনি দূরে পলাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২০শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

উপাসনার সংস্কৃত শ্লোকগুলি ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পার না বলিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া উপাসনা করিতে চাহিতেছ। এ প্রস্তাব এক হিসাবে মন্দ নহে। কিন্তু তোমাদের উপাসনা ত' কেবলই তোমার ব্যক্তিগত উপাসনা নহে, ইহা যে আবার একটু রূপান্তরে সর্ব্বজনীন উপাসনাও। সকলের সঙ্গে মিলিবার পক্ষে সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা যোগ্যতর ভাষা ভারতে আর কি আছে? ভগবান্ ভাবগ্রাহী। তোমার ভাবটুকুই তিনি গ্রহণ করিবেন, ভাষায় কোথায় কি পরিবর্ত্তন হইল, উচ্চারণে কোথায় এককণা ত্রুটি রহিয়া

গেল, তাহা তিনি দেখিবেন না। সুতরাং তুমি তোমার অন্তরের নানা সময়ের প্রার্থনা সমূহ অবশ্যই মাতৃভাষায়ই করিবে। কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট উপাসনাটীর ভাষা পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২০শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, * * * তোমরা প্রত্যেকে নিয়মিত নিজ নিজ সাধন-ভজন করিয়া যাইও। সাধন-ভজনের দ্বারা মন প্রসন্ন ও প্রশান্ত হইলে সেই মন কর্ত্তব্যপালনে হয় দুর্জ্জয় ও দুর্দ্দান্ত। তোমাদের সাধন-ভজন-দীপ্ত অপূর্ব্ব পৌরুষ দেখিয়া যেন অপরের দিব্য জীবন লাভের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহাই তোমাদের লক্ষ্য হউক। চালবাজি, কৌশল ও ধাপ্পা দিয়া মানুষকে আকর্ষণের কুপন্থা তোমাদের জন্য নহে। ধর্ম্ম-জগতে তোমাদের একটা আলাদা স্থান আছে, তাহা কখনও বিস্মৃত হইও না। আমাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া লোককে আকৃষ্ট করার চেষ্টার মত ভুল আর কিছু নাই। আমি আমার সাধারণ জীবনে যে নিষ্ঠা নিয়া সমাজের ও ধর্ম্মের সেবা

করিতেছি, তোমাদের মধ্যে তাহা আসুক। সত্যের বলে তোমরা জগৎকে সবলে আকর্ষণ কর। এমন কি অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা হইতেও তোমরা নিজেদের দূরে রাখিবে। সম্প্রদায়ে নূতন রক্তের আমদানী অবশ্যই হিতকর কিন্তু মিথ্যা-প্রবঞ্চনার সহায়তায় লোককে বিভ্রান্ত করিয়া দীক্ষার ফাঁস গলায় পরাইয়া দেওয়া পাপ এবং সর্ব্বনাশকর। তোমরা মানুষকে মানুষ হইতে উদ্ধুদ্ধ কর, তাহাকে নির্দ্দিষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত করিবার দিকে তোমাদের অসঙ্গত আগ্রহ যেন সর্ব্বদাই থাকে সংযমের অঙ্কুশে অবনত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২০শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, * * * চষা জমিতেই বীজ বুনিতে হয়, যেখানে সেখানে বীজ ফেলিলে সকল বীজে অঙ্কুর নাও গজাইতে পারে। তত্ত্বাবধানযোগ্য সুরক্ষিত ভূমিতে বীজ না বুনিলে অঙ্কুরিত হইবার পরে পাখীতে খাইয়া ফেলে। ক্ষেতের আইলে বেড়া বা পাহারা না থাকিলে গরু-ছাগলে সব গাছ নষ্ট করে। এইগুলি ভুলিয়া

গিয়া কাজ করিও না। পাঠ, কীর্ত্তন ও উপাসনার সহায়তায় চতুর্দ্দিকের জমি নিয়ত কর্ষিতে থাক। তোমাদের নিজেদের অন্তরের উন্মাদনা দিয়া দিকে দিকে দিব্যভাবের উন্মেষ সাধন কর। আত্মত্রাণের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জগৎত্রাণের সাধনাকে সুসমঞ্জস করিয়া লও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২০শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, * * * আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রাণের প্রাণ হইতে চেষ্টা কর। তোমাদের শত দেহ এক দেহ হউক, তোমাদের শত মন এক মন হউক, তোমাদের শত আত্মা এক আত্মা হউক। তোমাদের সঙ্ঘশক্তি যেন তোমাদের দাম্ভিকতার হেতু না হইয়া তোমাদের আধ্যাত্মিকতাই বর্দ্ধন করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২০শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, * * * তোমাদের জীবন হইতে অপর শত শত দূরবর্ত্তী নরনারী পাইবে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উজ্জীবন, তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া হইবে আশান্বিত, আগ্রহী ও আকৃষ্ট, তবে না তোমরা আমার পুত্রকন্যা বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিবে! ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২০শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

স্ত্রীকে দীক্ষা নিবার জন্য অত্যধিক পীড়াপীড়ি করিও না। কারণ সে ইতিমধ্যেই নিজস্ব কতকগুলি গোঁড়ামি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে জিদ্ ও গোঁড়ামি প্রবল, সেখানে জোর-জবরদস্তি করিয়া কাহাকেও দীক্ষিত করিলে দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধনে তাহার মন বসে না। প্রচণ্ড জেদ এবং নিদারুণ ঔদ্ধত্যকেও আমি দৃষ্টিমাত্রেই প্রশমিত করিতে পারি। কিন্তু দীক্ষার ব্যাপারে তাহা আমি করিব না। দীক্ষার্থিনী স্বেচ্ছায় দীক্ষা লইবে, সাগ্রহে, সানন্দে, সোল্লাসে এবং অফুরন্ত বিশ্বাস

লইয়া প্রবেশ করিবে দীক্ষার গৃহে, ইহাই আদর্শ অবস্থা এবং ইহাই বাঞ্ছনীয়। তুমি তোমার অক্লান্ত প্রয়াসের দ্বারা তোমার সহধর্ম্মিণীর জ্ঞানবুদ্ধির পরিপ্রসারে চেষ্টিত হও। অবিরত তাহাকে পরিবেশন করিয়া যাও সচ্চিন্তা। ক্রমশঃ এই কাজ করিয়া যাইবার ফলে তাহার দীক্ষা নিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইবে।

যে স্ত্রী বিবাহের পরেও দীর্ঘকাল স্বামীর কাছ হইতে দূরে থাকে, তাহার মনে নানাপ্রকারের বিরুদ্ধ চিন্তার দানা-বাঁধা স্বাভাবিক। বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে দীর্ঘকাল নিজ তত্ত্বাবধান হইতে বহুদূরে রাখা একটা প্রকাণ্ড রকমের মূর্খতা। দেশোচিত কুসংস্কার সমূহ বিবাহের পরেও যদি মনের ভিতরে আনাগোনা করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে অশান্তির সম্ভাবনা কমে কি করিয়া?

স্ত্রীটি তোমার আর এখনো কচি-কঞ্চিটী নহে যে হেলায় বাঁকাইয়া লইবে। শক্ত বাঁশে ইহা পরিণত হইয়াছে। ইহাকে কাজে লাগাইবার কৌশল আলাদা। সদ্ভাবের পরিবেশন দ্বারা ইহাকে তুমি ইক্ষুর ন্যায় রস-সমৃদ্ধ কর। তখন দেখিও, চিবাইয়া খাইলেও সে আর প্রতিবাদ করিবে না। ভিতরে ভগবৎপ্রেমরস আসিলে সে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, নিজের জন্য নহে, পরের জন্যই তাহার জীবন-ধারণ। তখন ঝাড় হইতে একটী ইক্ষু কাটিয়া নিলে মূলদেশ হইতে তিনটী অঙ্কুর গজাইবে। এভাবে চেষ্টা করিলে অনন্তকাল সে জগদ্ধিত সাধন করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ কলিকাতা

২১শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পাঁচ বৎসর ধরিয়া তোমরা আসামের একটী ক্ষুদ্র গঞ্জে জন্মোৎসব করিতেছ। কেহ তোমাদিগকে বলে নাই। নিজেদের অন্তরের প্রেরণায় ইহা করিতেছ। নয়দিন ধরিয়া চতুর্দ্দিকের পল্লীনগরগুলিকে পাঠ, কীর্ত্তন, উপাসনায় মুখরিত করিয়া রাখিতেছ। বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনি-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহাতে সাগ্রহে যোগদান করিতেছেন। তোমরা চাঁদা তুলিবার চেষ্টা কর নাই অথচ আপনা আপনি সকল কার্য্য স্বেচ্ছাদত্ত দানের অর্ঘ্যে সুসম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। তোমরা তোমাদেরই যোগ্য একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছ।

এইরূপ আরও বহুস্থানে হইতেছে। তাহার মূল কারণ যে আমার পুপুন্‌কী আশ্রমের অভিক্ষা ব্রত, এই কথাটি ভাবিয়া আমিও পুলকিত হইতেছি।

পুপুন্‌কী আশ্রম আজও তাহার কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া চলিতেছে। আজও সেখানে গেলেই আমি স্বহস্তে গাইত কোদাল লইয়া মাটি কাটি, স্বহস্তে হল-চালনা করিয়া জমি চষি, স্বহস্তে বীজ বুনি, চারা উৎপাদন করি, চারা চালাই, গোবর-সারের টুকরি মাথায় করিয়া আশ্রমের একপ্রান্ত হইতে শ' দেড়শ' বিঘা দূরবর্ত্তী অপর প্রান্তে ছুটিয়া যাই। এখনো সেখানে কেবল নির্ম্মাণই চলিয়াছে, আরও

কতকাল এই কার্য্য চলিবে, কে জানে? তবু কত যে আনন্দ সহকারে এই শ্রম করিতেছি, তাহা বলিবার নহে। আমার স্বাবলম্বন-ব্রত না থাকিলে আমার জীবনে শ্রমের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইত না। আমার জীবনে শ্রমের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হইলে তোমরা নিজেদের জীবনে শ্রমকে পূজার আসন দিতে পারিতে না। অতি অল্প ব্যয়ে তোমরা এক একটা বিরাট বিরাট উৎসব যে মহাসমারোহের মধ্য দিয়া সমাপন করিয়া যাইতে পারিতেছ, তাহার প্রধান কারণ তোমাদের শারীরিক শ্রমে শ্রদ্ধা। তোমাদের এই শ্রম-শ্রদ্ধা একদিকে তোমাদের অন্তরের ভক্তিকে সেবাকর্ম্মাত্মক পথে নিয়া যাইতেছে, অন্যদিকে কায়িক শ্রমের দ্বারা যাহারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, তাহাদের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা, প্রেম ও আত্মীয়তা বাড়াইয়াছে।

এখন তোমাদের প্রয়োজন প্রতিস্থানে প্রতিজনের সমাজ-সেবা-মূলক চিন্তাগুলি অধিকতর প্রাণবত্তা লইয়া অনুশীলন ও বিতরণ করিতে থাকা এবং সমাজ-সেবার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজের সুবিধা পাইলেও তাহাতে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া লাগিয়া যাওয়া।

এখন হইতে তোমাদের আরও অধিকতর সতর্ক লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার সামর্থ্যের নরনারীরাই তোমাদের মধ্যে আসিয়া প্রাণ ঢালিয়া যোগ দিতে পারেন, তাহার জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যেই অশেষ সম্প্রীতি সংরক্ষণ করিয়া চলা।

এখন হইতে তোমাদের আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে তোমাদের ধর্ম্মসঙ্ঘের অবশ্যম্ভাবী বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তোমরা

অপরাপর ভ্রান্তবুদ্ধি ধর্ম্মসঙ্ঘের অন্যায়ের অনুকরণে ঔদ্ধত্য ও মাৎসর্য্যের দ্বারা অভিভূত না হও। জগতের প্রত্যেকটী ধর্ম্মসঙ্ঘ যে তোমাদের সঙ্ঘের অনুপূরক এবং তোমরা যে প্রতিটী ধর্ম্মসঙ্ঘের দ্বারা প্রচারিত সত্যের পরিপূরক, এই কথাটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অন্তরে অবৈর ও অপক্ষপাত-ভাব পোষণ করা উচিত।

তোমাদের অভিক্ষা তোমাদের সবল মেরুদণ্ড দিয়াছে কিন্তু ইহা যেন তোমাদিগকে দর্প-দম্ভ-গর্ব্ব না উপহার দেয়। তোমাদের অসাম্প্রদায়িক আদর্শ তোমাদের বক্ষপুট আকাশের ন্যায় বিশাল করিয়াছে কিন্তু অপরাপর ধর্ম্মসঙ্ঘকে গ্রাস করিয়া তাহাদের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিবার লিপ্সা যেন তোমাদের না আসে।

ছোট, অনাদৃত, অজ্ঞান ও তথাকথিত অপাংক্তেয় ও অন্ত্যজদের মধ্যেই তোমাদের প্রচার প্রসার অধিক, ইহা তোমাদের এক মহাবলের উৎস। কিন্তু ইহার ফলে যেন গুণবান্ বড়কে হেলা করিবার, অবজ্ঞা করিবার, নিষ্পেষণ-নির্য্যাতন করিবার কুবুদ্ধি তোমাদের মধ্যে না আসে।

অনেক দিক্ দিয়াই তোমাদের সঙ্ঘ প্রচলিত সঙ্ঘসমূহ হইতে একটু বিশিষ্ট। এই বিশিষ্টতা যেন আবার তোমাদিগকে সকলের পর করিয়া না দেয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২২শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একই বিষয় নিয়া তোমার এবং শ্রীমান ন—র পরস্পর-বিরোধী পত্র পাইলাম। শ্রীমান ন—বলিতে চাহে যে, তুমি আশ্রমের স্বার্থগুলি অবহেলা করিতেছ এবং অপরের জমিগুলিকে আশ্রমের জমি বলিয়া দাবী করিয়া যাইতেছ। ইহাই তোমাদের প্রতিদিনকার দ্বন্দ্ব-কলহের কারণ এবং ইহা হইতেই যত অনিষ্টের উদ্ভব হইতেছে। তুমি বলিতে যাইতেছ যে, কোনও ব্যাপারেই তোমার কোনও দোষ নাই, তুমি তোমার গুরুভ্রাতাদিগকে কেবল নিয়মিত সমবেত উপাসনায় আসিতে, আশ্রমের কীর্ত্তনাদিতে যোগ দিতে এবং আশ্রমের জমির উপরে লাঙ্গল চষিয়া বীজ বুনিয়া ফসল কাটিয়া বেদখল না করিতে বলিতেছ। মোটামুটি বুঝা যায় যে, জমি লইয়াই আসল কলহটা বাঁধিয়াছে। দশ জন গ্রাম্য মাতব্বরকে সালিশ মানিয়া কলহটা আপোষে মীমাংসা করিয়া ফেল। তোমাকে তোমার গুরুভ্রাতা নামধারী আততায়ীরা রোজ রোজ রাস্তায় ধরিয়া মারিয়া পিটিয়া রক্তদর্শন করিবে, ইহা শুভ নহে। তুমিও তোমার কর্কশ কণ্ঠটাকে যতটা পার সরস ও মোলায়েম কর। মিষ্টি কথায় যেখানে কাজ হইবে না, সেখানে বরং তোমার কাজ বন্ধই রহিল। চোপা বাজাইয়া, কলহ করিয়া, অপ্রীতিকর বাদানুবাদের অবতারণা করিয়া অনাদর্শ দৃষ্টান্ত দেখান বিবদমান পক্ষদ্বয়ের কাহারও পক্ষেই হিতকর নহে। এখন

Created by Mukherjee TK, DHANBAD

যাহাদিগকে শত্রুবৎ দেখিতেছ, তাহাদের সকলেরই মনোভাব বা আচরণ চিরকাল এইরূপ থাকিবে না। তাহাদের মধ্যেও একটী দেবতা ঘুমাইয়া আছেন। সেই দেবতার প্রেম আছে, ত্যাগ আছে, ক্ষমা আছে। সেই দেবতাকে জাগাইয়া তোল। আজ যাহা অসাধ্য মনে হইতেছে, তাহা চিরকালই অসাধ্য থাকিবে না। সুতরাং তোমার আজিকার ব্যর্থতাকে চিরন্তন ব্যর্থতা বলিয়া তুমি মনে করিও না।

তুমি তদ্দেশব্যাপী বহু অনাচারের সত্য কারণ কি উদ্‌ঘাটন করিয়াছ। পরের জিনিষ না বলিয়া নিবার প্রবৃত্তি একটী ঢেঁড়স চুরি হইতে আরম্ভ করিয়া জমি চুরি, মেয়ে চুরি শেষ পর্য্যন্ত দেশ-মহাদেশ চুরিতে পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত হইতেছে। সকলেরই মূল উৎস এক। প্রাপ্তির অবৈধ লালসা মানুষকে বারংবার এই সকল অসৎ কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছে। পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ শাস্ত্রোদ্ভব-দেশের স্বাভাবিক ধাত অনুযায়ী এক এক প্রকার মানুষের লালসাকে খর্ব্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এই চেষ্টার ভিতর কটুবাক্য বা অপ্রেমের স্থান নাই। তুমিও একটা ধর্ম্মসংঘেরই প্রতিনিধিরূপে ওখানে বাস করিতেছ। তোমাকেও ধর্ম্মদানের ভিতর দিয়াই সকলের মনে লোভ-লালসার নিবৃত্তি সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে।

সমাজের ভিতর যে সকল অনাচার অপচার দেখিতেছ, তাহার কারণ-নির্ণয়ও তোমার নির্ভুল হইয়াছে। বয়স্ক পুরুষ-নারীরা নাবালক বালক-বালিকাদের চক্ষুর উপরে অসম্বৃত ব্যবহার করিলে তাহার কুফল সমস্ত সমাজটাকে দূষিত করেই। বাড়ীতে পায়খানা, স্নানাগার প্রভৃতি না রাখা এবং নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে যে-কোন ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে মলত্যাগ করিতে বসা আর যে-কোন ডোবা-নালায় স্নানাদি

করিতে যাওয়া পরিণামে যে সমাজের মধ্যে অনৈতিক লালসা জাগায়, ইহা মিথ্যা নহে। কোনও ব্যক্তিকে আক্রমণ না করিয়া এই কুপ্রথাগুলির কুফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সৎ কথা সকলের সঙ্গেই কহিতে পার। ব্যক্তিগত আঘাত বলিয়া মনে করিলে লোকে ভাল কথাতেও চটিয়া যায়। কিন্তু চটিয়া গেলে তাহার দ্বারা সংশোধন-মূলক কোন কাজ হয় না। অথচ তাহার সংশোধনটাই প্রধান প্রয়োজন, তাহার বদমেজাজী দিয়া কাহারওই লাভ নাই।

তবে, আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারী হইয়া কেবল গ্রামবাসীদের খারাপ দিকটাতেই নজর রাখিলে অজ্ঞাতসারে নিচের অধঃপতন আসিয়া যায়। এজন্যই সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে মানুষকে ক্ষমা আর ভগবানের নিকটে প্রার্থনা, এই দুইটী অবলম্বন করিয়া অধার্ম্মিকদিগকে ধার্ম্মিক, অসাধুদিগকে সাধু এবং অবিবেকীদিগকে বিবেক-সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতে দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা তুমি অধিক মনোযোগ দিও নিজের ভগবৎ-প্রেম বৃদ্ধির চেষ্টায়। তোমার ঈশ্বর-প্রেম যতই গভীর হইতে থাকিবে, বিনা চেষ্টায় তোমার মন সর্ব্বসাধারণের প্রতি তত মধুময় হইবে। মানুষ পাপ করিতে করিতে জাহান্নমে গেল, ইহা যদি দোষের হয়, মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারীর অফুরন্ত ঈশ্বর-প্রেম আসিল না, ইহা কি তাহা অপেক্ষা কম দোষের হইবে? অপ্রেমের চেয়ে বড় দোষ আর কি আছে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২২শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রীমান মা—র নিকট হইতেও এক পত্র পাইয়াছি, তোমার কাছ হইতেও আর এক পত্র পাইলাম। আশ্রমের ব্রহ্মচারী আশ্রমের জমিগুলির উপরে যোগ্য দৃষ্টি রাখিতেছে না এবং ইহার জন্য কূটবুদ্ধি কোনও আইনব্যবসায়ীর হাতে আশ্রমের মরা নদীটুকু সব চলিয়া যাইতেছে, এই বেদনা সহিতে না পারিয়া তুমি আশ্রমের ক্ষতিতে বিহ্বল হইয়া আশ্রম-তত্ত্বাবধায়ক ব্রহ্মচারীকে কি জন্য মারিয়াছ, তোমার পত্র তাহার কৈফিয়ৎটা বহন করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু সে যে তোমাকে মারিয়াছে, তোমার পত্রে মাত্র অতটুকু খবর পাওয়া গেল। তার যে শরীর রক্তাক্ত হইয়াছে, এই সংবাদ তোমার পত্রে নাই। পত্রই যখন লিখিলে, তখন আর একটু সবিস্তার লেখা উচিত ছিল।

পূর্ব্ববঙ্গে শুনা যায় মুসলমানের অত্যাচারে হিন্দু তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু তোমাদের আচরণে দেখা যায়, হিন্দুর সহিতই হিন্দুর সম্পর্ক মধুর নহে। তদুপরি তোমরা এক সময়ে স্বজনগণ সহ আশ্রমে দীক্ষিতও হইয়াছিলে। অধঃপতনের কোন্ সীমায় পৌঁছিলে গুরুদেবের আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে নিত্য কলহ করা যায়, তাহা ত' আমার বোধগম্য হইতেছে না। তোমাদের অধিকাংশেরই মুখের লাগাম নাই। হাতপায়ের সংযমও খুব প্রশংসনীয় নহে। লোকে নিন্দা করিবে কি প্রশংসা করিবে, সেই দিকে তোমাদের লক্ষ্যই নাই। কয়টা

বৎসর ধরিয়া কেবল কলহ, কেবল অশান্তিই তোমাদের মধ্যে চলিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করি ইহার কি শেষ হইতে পারে না? গ্রামের দশ জন লোকে কি ইহা মিটাইতে পারেন না? তাহারাও সকলে তোমাদের দুইজনের মতনই অজ্ঞ বা অন্ধ, কে এমন অলীক কথায় বিশ্বাস করিতে পারিবে? আরও জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি নিজ নিজ গুরুদত্ত সাধন করিতেছ? তোমরা কি সেই সাধনাকে দ্রুত-সিদ্ধিদায়িনী করিবার জন্য সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্যের উপর লক্ষ্য রাখিতেছ? ব্রহ্মচর্য্যে যার অনাস্থা, তাহার সাধন-চেষ্টা বাহ্যাড়ম্বরই প্রসব করে। তোমরা সকলেই আমার শিষ্য, মুলুকজোড়া এত শিষ্য ঐ দেশে আর কোনও গুরুদেবের হয় ত' নাই। তোমরা প্রায় সকলেই ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অনাস্থা হেতু নামে মাত্র শিষ্য রহিয়াছ। দুই চারি মাস ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া দেখিবে? দেখিবে, তাহাতে লোভ-লালসা কমে কিনা, অকারণ কলহের প্রবৃত্তি প্রশমিত হয় কিনা? ব্রহ্মচর্য্য যে কত বড় শক্তি, ব্রহ্মচর্য্য যে কত বড় শান্তি, একথা বলিতে বলিতে আমার জীবনের পরমায়ু কেবলই ক্ষয়িত হইতেছে কিন্তু তোমরা কেহই তাহাতে কর্ণপাত করিলে না। তাই তোমাদের ক্ষমা আসিল না, প্রেম আসিল না, ধৈর্য্য আসিল না, সরলতা আসিল না, সত্যের প্রতি অনুরাগ আসিল না। কতকাল তোমরা অপ্রেমিক হইয়া পৃথিবীতে বাস্তব্য করিবে? প্রেমহীনের বাঁচা-মরায় পার্থক্য কোথায়? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২২শে আষাঢ়, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দূর হইতে দূরান্তরে কেবল বদলী হইতেছ। কিন্তু ইহাতে মন খারাপ করিও না। প্রত্যেক যায়গায় গিয়া পরিচিত-মণ্ডলী সৃষ্টি করিয়া লও এবং এই পরিচয় সৃষ্ট হউক উচ্চভাব, উচ্চপ্রেরণা এবং ভগবৎ-কথা-মধুর প্রেমের মধ্য দিয়া। স্বার্থের ভিতর দিয়া যাহাদিগের সহিত পরিচয় হয়, তাহাদিগের সহিত দীর্ঘকাল সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু ভগবানের কথা লইয়া যাহাদের সহিত আত্মীয়তা জন্মে, তাহাদের কাছ হইতে আর ভেদ-বিচ্ছেদ আসে না। কে তোমার ন্যায় বাঙ্গালী, কে তৈলঙ্গী বা তিব্বতী, তাহার বিচার ভগবানের কাছে নাই। এই একটা বিষয়ে প্রবাসী বাঙ্গালীদের দৃষ্টি বড়ই ঝাপ্সা বলিয়া, তাহারা নানা দেশ ঘুরিতেছে, কিন্তু কাহারও আপন হইতেছে না।

পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, মাড়োয়ারী বা বিহারীরা দূর-দূরান্তরে বদলী হইলে হাসিয়া তথায় চলিয়া যায়। আর তোমরা বাঙ্গালীরা কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া কলিকাতার আশে-পাশে আসিতে ব্যস্ত। দেরাদূন সহরটায় কত বাঙ্গালী দেখিয়াছি। এখন সহরে বাঙ্গালী নাই বলিলেই চলে। ক্রমশঃ বাঙ্গালীদের সংখ্যা এতই মুষ্টিমেয় হইয়া যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে অনুমানই করা যাইবে না যে এই সহরটায় একদিন বাঙ্গালীদের বিশেষ প্রভাব ছিল। তোমাদের আর একটা দোষ এই

যে, তোমরা যেখানেই যাও, চাকুরী করিতে যাও। মানুষের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিয়া তাহাদিগকে লাভবান্ এবং নিজেদিগকে নূতনতর ভাবের সম্পদে সমৃদ্ধ করিতে চাহ না। তোমাদের মনীষীদের চিন্তা তাহাদিগকে পরিবেশন করা প্রয়োজন। তাঁহাদের মনীষীদের উপলব্ধির সহিত তোমাদের পরিচয়-স্থাপনও আবশ্যক। দিয়া এবং নিয়া বড় হইতে হয়। তোমরা দিতেও চাহ না, নিতেও চাহ না। বড় হইবে কি প্রকারে? কেরাণীর দল নিখিল ভুবন ঘুরিয়া চাকুরী করিয়া অবসর-প্রাপ্ত অলস জীবন কাটাইবার জন্য কলিকাতার উপকণ্ঠে বাড়ী খোঁজে—ইহাই তোমাদের প্রকৃতি। যেখানে যাইতেছ, সেখানে তোমার জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীদের শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া আস, তাহাদের দেশ হইতে যত পার শ্রেষ্ঠ চিন্তা কুড়াইয়া কাচাইয়া আন। ইহাই সুস্থ এবং জীবিত জাতির লক্ষণ। কথাগুলি প্রেম-সহকারে চিন্তা করিও। সারাদিন সারারাত কেবল চাকুরীই করিবে, নিজেরা মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য চেষ্টা করিবে না, অপরকেও মানুষ হিসাবে উন্নত করিবার প্রয়াস পাইবে না—ইহা কোনও কাজের কথা নহে। স্বদেশ বিদেশ সর্ব্বত্রই তোমাদের চাই প্রেমের বন্ধন। সর্ব্বজাতি সর্ব্ববর্ণে প্রসারিত হইবে তোমাদের প্রেমিক বাহু, সকলের সহিত হইবে অন্তরের নিগূঢ় প্রেমসম্পর্ক স্থাপন, সকলকে করিয়া লওয়া চাই আপনার আপন। ঘরকুণো বুদ্ধি ছাড়িতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

Created by Mukherjee TK, DHANBAD

(৬২)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২২শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যেখানেই অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপিত হউক, সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা মাত্র একদিনই হইবে, প্রত্যহ হইবে না। তবে বিভিন্ন গৃহে উপাসনার আমন্ত্রণ থাকিলে একাধিক দিনেও হইতে পারে। সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট বারটীতে প্রত্যেকের যোগদানের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য বারের সমবেত উপাসনায় সকলে যোগদান করিতে না পারিলে যে যে পাড়ায় অনুষ্ঠান হইতেছে, সেই সেই পাড়ার উপাসক-উপাসিকাদের সংখ্যাগুরুত্ব একান্ত প্রয়োজন। সমবেত উপাসনা উপলক্ষ্য করিয়া কোনও ঝগড়া-ঝাটি করা কর্ত্তব্য নহে।

দৈনন্দিন উপাসনা প্রত্যেকে প্রত্যহই করিবে, সাধ্যপক্ষে চারিবারই করিবে। অন্ততঃপক্ষে দুইবার ভালভাবে করিয়া দুইবার সংক্ষেপে সারা যাইতে পারে। দৈনন্দিন উপাসনাতে নামজপের অংশটাই প্রধান এবং তাহাতেই অধিক সময় দেওয়া কর্ত্তব্য। নামজপের দিকটা অবহেলিত হইলে উপাসনার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। দৈনন্দিন উপাসনা উচ্চৈঃস্বরে করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, যদিও বীজমন্ত্র ব্যতীত অন্য স্তোত্রাদি উচ্চৈঃস্বরে করিলে দোষ নাই।

সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় সকলের মনে, মতে, কণ্ঠে, সুরে, উচ্চারণে, আচরণে মিল রাখার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে।

সমবেত উপাসনাটি মহামিলনের সাধনা। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের ভান করিয়া কেহ কোনও অন্যায় কার্য্যের অভিসন্ধি করিলে তাহার গৃহে সমবেত উপাসনা না হওয়াই ভাল। এমন অনেক দুষ্টলোক আছে, যাহারা নিজ গৃহে পরের বাড়ীর যুবতী ও কিশোরীদের ভিড় জমাইবার মধ্যে তামসিক আনন্দ পায়। এমন গৃহে সমবেত উপাসনা হইলে মহিলারা তাহাতে যোগ দিবেন না। সমবেত উপাসনাকে আশ্রয় করিয়া কোনও স্থানে কোনও মহিলার অসম্মান-সম্ভাবনা দেখা গেলে মহিলারা নিজেরাই যেন সঙ্গোপনে সাবধান হইয়া যান। পাপী, তাপী অপরাধী, অন্যায়কারী, দাগী এবং দস্যু সকলের গৃহেই আমরা সমবেত উপাসনা করিব। কিন্তু মহিলারা কাহার গৃহে যাইবেন বা না যাইবেন, তাহার নির্ব্বাচনভার তাঁহাদের নিজেদের উপরেই থাকিবে। কেন কোন মহিলা কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহে যাইতে চাহেন না, তাহার সম্পর্ক অনেক আলোচনা করিয়া জলঘোলা করিবার প্রয়োজন নাই।

সমবেত উপাসনা কালে, তাহার আরম্ভের পূর্ব্বে অথবা সমাপ্তির শেষে যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট পুরুষ ও মহিলার ভিতরে অতিরিক্ত কাছাকাছি, ঘেষাঘেষি, ঘনিষ্ঠতা, বাড়াবাড়ি দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু ইহা লইয়া জনসমক্ষে কোনও আলোচনা চলিতে পারিবে না। সংঘের সুনাম রক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সকলকে চলিতে হইবে, তোমাদের মধ্যে একজনের চাল-চলন হয়ত আপত্তিজনক মনে হইল, কেহ ইহা নির্দ্দোষ ভাবিল, কেহ ইহাতে দোষ আবিষ্কার করিল আর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সঙ্ঘ একেবারে কুরুপাণ্ডবের শিবিরে বিভক্ত হইয়া

গেল এবং জনসাধারণের চোখে তাক্ লাগাইয়া দিয়া কেহ আগ্নেয়াস্ত্র, কেহ বায়ব্যাস্ত্র, কেহ বরুণাস্ত্র, কেহ পাশুপতাস্ত্র বর্ষণ করিতে সুরু করিল। এই জাতীয় অবস্থা তোমাদের ব্যক্তিগত শালীনতার এবং সঙ্ঘগত সুসংবদ্ধতার ঘোরতর অপচয়কারক, জানিও।

সমবেত উপাসনা একটি অতিশয় গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান। যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, উপাসনার ফলবত্তায় আস্থা আছে, উপাসনায় যোগ দিবার অধিকার তাহারই আছে। কিন্তু এই অধিকারের সুযোগ লইয়া অনেক কুচরিত্র লোক অসদুদ্দেশ্যেও সমবেত উপাসনায় যোগদান করিতে পারে। সুতরাং উপাসনা হইয়া যাইবার পরে আর গুলতানি না করিয়া প্রত্যেক উপাসক-উপাসিকা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইবেন, ইহাই নিয়ম হওয়া উচিত। খ্রীষ্টানরা গীর্জ্জায় উপাসনার পরে সেখানেই ঢলাঢলি করেন না। মুসলমানরা নামাজ হইয়া যাইবার পরে মসজিদে বসিয়াই গল্পগুজব করিতে বা তাস পিটিতে লাগিয়া যান না। তাঁহাদের আচরণের এই সংযম আমাদের মধ্যেও থাকা প্রয়োজন। সর্ব্বজীবে প্রেমানুশীলনের জন্যই আমরা সমবেত উপাসনা করিতেছি কিন্তু সেই উপলক্ষে জান্তব প্রেম আর জৈব-লালসার না হয় প্রশ্রয়, ইহা অবশ্যই দেখিতে হইবে। যেখানে সমবেত উপাসনা হইতেছে, সেই মণ্ডপটী যতই অস্থায়ী জিনিষ হউক, তাহাকে মন্দির বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা এই মন্দির-মধ্যে অবস্থান করিতেছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা প্রতি জনে দেহে মনে শুচি, আচরণে পবিত্র, ব্যবহারে বিনীত এবং পরস্পরের সহিত সম্বন্ধে একেবারে স্বচ্ছ থাকিবে, এই সঙ্কল্পটী

করিবে এবং এই সঙ্কল্প হইতে চ্যুত হইবে না। শিশুদের কোলাহল এখানে যেমন করিয়া শাসন করিয়া রাখিতে হইবে, কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতীদের অন্তরের জৈব তাড়নাকেও তেমন অঙ্কুশতাড়নে প্রদমিত করিতে হইবে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী আর জগৎসিংহকে দেবমন্দিরে প্রথম সাক্ষাৎ করাইয়াছিলেন এবং সেখানেই তাঁহাদের প্রেমের সঞ্চার দেখাইয়াছেন। ইহা হিন্দুর মনঃপুত আদর্শ নহে।

পল্লীগ্রামে অনেক স্থানে পুরুষদের সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা হয়ত ছুটীর দিনে হয় আর মহিলাদের সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা হয় মঙ্গলবারে। পুরুষদের সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার সময়ে যোগদানকারিণী মহিলাদের সংখ্যা অত্যল্প থাকে। আর মহিলাদের সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতে পুরুষেরা অতি অল্প-সংখ্যকই আসিয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষ বিশেষ উপাসনার তারিখগুলিতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেই মিলিয়া থাকেন।

সমবেত উপাসনায় উপবেশনকালে পুরুষেরা এক দিক দিয়া এবং মহিলারা অপর দিক দিয়া একাইয়া বসিবেন, ইহাই রীতি। সুরজ্ঞতা এবং কণ্ঠ-মাধুর্য্যের বিবেচনায় কখনও কখনও সামান্য রীতি-ভঙ্গ অনুমোদনের অযোগ্য নহে। কারণ, সম্মুখের দিকে উপবিষ্ট সুশিক্ষিত-কণ্ঠ কয়েকজনের সুর ও লয়কে পশ্চাদ্বর্ত্তীরা অনুসরণ করিয়া থাকেন। সুর-জানা এবং সুর-না-জানা লোকদের এক-যায়গায়

খিচুড়ী পাকাইয়া বসা ঠিক নহে। উপাসনার গাম্ভীর্য্য এবং বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সুরজ্ঞদের কাছাকাছি বসিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু কোনও সুরজ্ঞ যদি উপাসনা আরম্ভ হইবার পরে আসেন, তবে তাঁহাকে যথালব্ধ স্থানেই বসিতে হইবে, মানুষের ঘাড়ের উপর পা চালাইয়া আগাইয়া বসিতে দেওয়া হইবে না।

মোট কথা, মানুষের শৃঙ্খলা-জ্ঞান এই সকল বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে মানুষকে সহায়তা করিবে। সব ব্যাপারেই গুরুদেবকে যদি কেবল আইনের পর আইন রচনা করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে শিষ্যদের মস্তিষ্ক বস্তুটির প্রয়োজন কি থাকে?

সমবেত উপাসনার আসরটিতে উপাসক-উপাসিকাদের বসিবার স্থানটির এইরূপ সঙ্কুলান ও সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যেন একজনের সঙ্গে আর একজনকে ঠেলাঠেলি, ঘেষাঘেষি করিয়া বসিতে না হয়। যেখানেই এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা সম্ভব, সেখানে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তালে-বেতালে আঁকাবাঁকা ভাবে না বসিয়া যথাসাধ্য সরল রেখায় বসাই সঙ্গত। উপাসনা-কালে মেরুদণ্ড সরল রাখিতে হইবে।

রুগ্ন এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকলকেই অঞ্জলি-কালে দাঁড়াইয়া অখণ্ড-স্তোত্র পাঠ করিতে হইবে। অঞ্জলি-মন্ত্র পাঠের সময়ে নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া আগাইয়া দাঁড়াইবার রীতি আপত্তিজনক।

অঞ্জলি দানের সময় হুড়াহুড়ি বর্জ্জন করিবার জন্য স্থানীয় পরিকল্পনানুযায়ী যথোচিত ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

বিশেষ বিশেষ সমবেত উপাসনায় নবাগত ভদ্রলোকদের হাতে সমবেত উপাসনার মুদ্রিত নিয়মাবলী পূর্ব্বেই বিতরণ করিয়া রাখা সঙ্গত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ | কলিকাতা
২৩শে আষাঢ়, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

উপাসনায় বসিয়া অখণ্ড-সংহিতার নির্ব্বাচিত অংশই পড়া সঙ্গত এবং সাধারণ অবস্থায় পনের বিশ মিনিটের অধিক পাঠ চালান উচিত নহে। অখণ্ড-সংহিতা পাঠের তাৎপর্য্য এই যে, ইহা দ্বারা বর্হিম্মুখ মনটা কতকটা একমুখ হইবে। অত্যাধিক সময় অখণ্ড-সংহিতা পাঠ চলিলে শ্রোতার ধৈর্য্যচ্যুতি আসিতে পারে, তাহাতে মনের একমুখতা হ্রাস পায় আবার উপাসনা শেষ হইতেও ইহার দরুণ অত্যধিক বিলম্ব হইয়া যায়। এই কারণেই উপাসনা-কালীন

অখণ্ড-সংহিতা পাঠের সময়কে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইতেছে। উপাসনা আরম্ভ কালেই অখণ্ড-সংহিতা পাঠ নিয়ম। উপাসনা শেষ হইবার পরে পুনরায় পাঠ অনাবশ্যক। সমবেত উপাসনাতে আগে ও পিছে দুইবার করিয়া অখণ্ড-সংহিতা পাঠের নিয়ম তোমরা প্রবর্ত্তন করিও না।

অবশ্য, উদয়াস্ত হরি-ওঁ কীর্ত্তনের ন্যায় প্রয়োজন-স্থলে তোমরা উদয়াস্ত অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিতে পার। ইহাকে বলা হয় অখণ্ডপাঠ। প্রথমে অখণ্ড-স্তোত্র দ্বারা বিগ্রহে অঞ্জলি দিয়া লইলে, তৎপর বিগ্রহকে আংশিক দক্ষিণে রাখিয়া পাঠক পাঠ আরম্ভ করিলেন। শ্রোতারা বিগ্রহের দিকে মুখ রাখিয়া পাঠ শুনিতে লাগিলেন। স্থানের অসঙ্কুলান হইলে বিগ্রহ আংশিক বামে রাখিয়াও পাঠারম্ভ চলিতে পারে। কিন্তু দক্ষিণে রাখিয়া পাঠই প্রশস্ততর। ইহার কোনও বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক যুক্তি নাই। কিন্তু বিগ্রহ দক্ষিণে রাখাই সজ্জন-সম্মত প্রচলিত প্রথা।

অখণ্ড-পাঠ আরম্ভ হইলে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অবিশ্রাম পাঠ চলিবে। তখন নির্ব্বাচনের কোন প্রশ্ন নাই। গ্রন্থের যে-কোনও খণ্ড গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্ত-কালে যেই খণ্ডের যেখানে শেষ হইবে, সেখানেই ইতি করিতে হইবে। একই ব্যক্তির পক্ষে এত দীর্ঘকাল পাঠ সম্ভব নহে। অতএব মাঝে মাঝে পাঠক-পরিবর্ত্তন চলিবে। প্রণাম করিয়া প্রত্যেকের পাঠারম্ভ এবং প্রণাম করিয়া পাঠ-শেষে

চলিতে থাকিবে। অখণ্ড-পাঠ শেষ হইয়া গেলে পুনরায় বিগ্রহে অঞ্জলি হইবে এবং তৎপরে প্রসাদ আদি বিতরণ হইবে। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মধ্যস্থলে বারংবার প্রসাদ বিতরিত হইবে না। অবশ্য, পাঠ ও শ্রবণাদির কোনও বিঘ্ন না করিয়া যদি মণ্ডপের বাহিরে নীরবে ও বিনা কোলাহলে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা কোথাও সম্ভব হয়, তাহা হইলে উহার উপরে কোনও নিষেধ নাই।

অখণ্ড-পাঠ-কালে মাঝে মাঝে শ্রোতার পরিবর্ত্তনও স্বাভাবিক কিন্তু তাঁহারা নিঃশব্দে আসিবেন, শুনিবেন এবং যাইবেন। যাওয়া-আসাটার মধ্যে হট্টগোল থাকিবে না।

সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে এভাবে অখণ্ড-পাঠ খুবই প্রীতিকর। অখণ্ড-পাঠের পাঠক-নির্ব্বাচনে সর্ব্বদা সাত্ত্বিকী দৃষ্টি রাখিবে। লোকচক্ষে হেয় ব্যক্তি অখণ্ড-পাঠের অখণ্ড-সংহিতা পাঠ সুরু করিলে তাহা দ্বারা শ্রোতার শ্রদ্ধা কমিতে পারে। কিন্তু পাঠক যিনিই নির্ব্বাচিত হউন, তাঁহার যেন পাঠ-শৈলী আয়ত্ত থাকে। ক্ষীণ কণ্ঠে, অত্যুচ্চ চীৎকারে, অস্পষ্ট উচ্চারণে, নাকিসুরে বা জাবর কাটিতে কাটিতে পাঠ করিলে সেই পাঠে কাহারও হৃদয় আকর্ষিত হয় না। ভক্তিমান্ বিশ্বাসী শুচিশুদ্ধ ব্যক্তি পাঠে বসিবেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

ইহা ছাড়াও প্রত্যেক মণ্ডলীর তরফ হইতে এই ব্যবস্থা হওয়া খুবই ভাল যে, প্রত্যহই একটী করিয়া স্থানে গিয়া কেহ না কেহ কিছু না কিছু জনসাধারণকে এক ঘন্টা কাল ধরিয়া অখণ্ড-সংহিতার

Created by Mukherjee TK, DHANBAD

নির্ব্বাচিত অংশ সমূহ পাঠ করিয়া শুনাইবেন। ইহা দ্বারা শ্রোতা এবং পাঠক উভয়েরই অশেষ হিতসাধিত হইবে। প্রত্যেক পরিবারে এইরূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হওয়া সঙ্গত যে, সারাদিনের পরিশ্রমের পরে শয্যায় যাইবার আগে সকলে বা পরিবারস্থ অধিকাংশে মিলিয়া বিশ পঁচিশ মিনিটকাল অখণ্ড-সংহিতা অবশ্যই পাঠ করিবে। প্রত্যেক পরিবারেই এমন কতকগুলি লোক থাকে, যাহারা দশ জনের সেবা করিয়াই হয়রাণ হয়, নিজেদের সাধন-ভজনে বসিবার সময়টুকু আর পায় না। এভাবে অখণ্ড-সংহিতা পঠিত হইলে তাহাদের বিশেষ সহায়তা হইবে।

প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত উপাসনার আগে প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য অখণ্ড-সংহিতার কিয়দংশ পাঠ করিয়া তাহার পরে উপাসনা আরম্ভ করা। সম্ভব হইলে এই নিয়ম তোমাদের সকলেরই অনুসরণ করা ভাল। অখণ্ড-সংহিতা আমার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি। অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করা আর আমার সঙ্গ করা এক কথা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত)